পঞ্চবটী।

(অভিনব গল্প পুস্তক)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত।

বাণী-পুস্তকালয়।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
১৩নং বলরামঘোষের ষ্ট্রীট্ বাগ্‌বাজার,
কলিকাতা।

সাহিত্য-সাধনার জন্য "পঞ্চবটী" রচনা করিলাম। কত জন্ম সাধনার পর এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব তাহার স্থিরতা কি! এ অজ্ঞাতকুলশীলের উত্তর-সাধক কে হইবে? আপনারা সিদ্ধপুরুষ! দরিদ্রের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কি আপনাদের উপেক্ষার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে? কিন্তু মহতের লক্ষণত তাহা নহে! এ অধম ভ্রাতাকে, এ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মূঢ়কে পথপ্রদর্শন করুন, আমি নিরাপদে আপনাদের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদকে মস্তকে লইয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি!

উৎসর্গ।

যাঁহার কৃপায় এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াছি

যাঁহার অপরিমেয় স্নেহে ভঙ্গুর দেহ পুষ্ট হইয়াছে

যাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণে

আমি ইহ-পর-জীবনে ঋণী

সেই নর-দেবতার পূজনীয় চরণ-কমলে

"পঞ্চবটী'

অর্পণ করিলাম।

নিবেদন।

আমার মায়ের অভাব কি! কত মাতৃভক্ত সন্তানের কৃতিত্বে আজ মা আমার সৌন্দর্য্য-সম্পদে গৌরবান্বিতা; কিন্তু তথাপি অশান্ত প্রাণকে লইয়া এই ক্ষুদ্র পূজার আয়োজন! মা, স্নেহ-করুণা-পরবশে এ অধম সন্তানের ক্ষুদ্র পূজোপচার তোমার অভয়পূর্ণ অঙ্কলে তুলিয়া লও! আমি ধন্য হই!

Printed and published by
Abhoya Charan Sanyal.
At the Bengal Art Press
17, Mohon Bagan Row, Calcutta.
1909

পঞ্চবটী।

উত্তরে

প্রথম বৃক্ষ—বিল্ব।
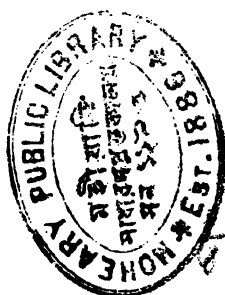
ভুল

"Err is human"

আকাশে পাৎলা পাৎলা মেঘ রহিয়াছে,— অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে,— থাকিয়া থাকিয়া বায়ু বহিতেছে,— পল্লীগ্রামের পথ-ঘাট অল্প-বিস্তর কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে,— স্থানে স্থানে জলও দাঁড়াইয়াছে। রাস্তা ঘাটে লোকজন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের পথ দিয়া অনেক দূর আসিলাম, বড় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। একজন চাষী কোদালি হস্তে টোকা মাথায় দিয়া মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল—ভিজা গামছা পরা—শীতলবায়ু তাড়নে কণ্টকিত-দেহ চাষী হাত দুইটিকে

পশ্চাতে রাখিয়া ঈষৎ নতদেহে পথ চলিয়া আসিতেছে; অনাবৃত দেহের প্রায় সকল স্থানই কর্দ্দমাক্ত! তাহার এই অবস্থা দেখিয়া স্বতঃ আমার মনে হইল, এই চাষী, ইহাদের সম্বন্ধে আমরা কত উদাসীন! গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র উন্মুক্ত মস্তকে বহন করিয়া, বরষার অজস্র প্লাবন অনাবৃত দেহে সহ্য করিয়া—বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে আপনার জীবনীশক্তিকে ক্রমাগত নষ্ট করিতেছে কাহাদের জন্য? এই যে আমি দূর সহর হইতে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যভিক্ষার উদ্দেশে এই বর্ষায় বৃষ্টিবাদলে কষ্ট করিয়া এই পল্লীগ্রামে আসিয়াছি, তাহার মূল কোথায়? তাহার মূল আমাদেরই স্থূল দৃষ্টির মধ্যে, আমাদেরই ভ্রমাত্মক কার্য্যের মধ্যে!—বলিতেছি।

দুর্ভিক্ষ কাহাদিগকে লইয়া? দেশের দশ পাঁচ জন ধনবান লোক লইয়া দুর্ভিক্ষ নহে;—এই চাষী এবং তাহারই মত অবস্থাপন্ন লোকসমষ্টি লইয়া দুর্ভিক্ষ! তাহারা দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পায় না! কেন পায় না? সারাটি বৎসর শিশির বৃষ্টি রৌদ্র সহ্য করিয়া যে শস্য উৎপাদন করিল, যখন সেই শস্য বিভাগের সময় আসিল, তখন সেই উৎপন্নের অর্দ্ধেক ত ন্যায়গত হিসাবে লইলাম; তাহার পর উত্তমর্ণরূপে তাহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে তাহার আসল, সুদ ও সুদের সুদ পর্য্যন্ত কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া তাহাদিগকে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরাইয়া দিলাম! সমস্ত বৎসরের পরিশ্রমের পুরস্কার, প্রভুর গোলাবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে স্তূপাকারে ফেলিয়া সে শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিয়া গেল! গৃহে

ফিরিয়া অভুক্ত পরিবারের দীর্ঘনিশ্বাস, ক্ষুৎপীড়িত বালকবালিকার কাতর ক্রন্দন তাহাকে কি মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে দেয়? উত্তমর্ণের খাতায় আবার ঋণের বোঝা বাড়িতে লাগিল। পক্ষান্তরে আমরা সেই চাষীর নিকট হইতে সমস্ত বৎসরের পরিশ্রমজাত শস্য অপহরণ করিয়া তদ্বিনিময়ে বিলাসিতার উপকরণ সমূহ ক্রয় করিতে থাকি! আপনার দেশবাসীকে অনশনে মারিতে কেন এত স্বার্থময় কুটিল উদ্যোগ! আমার তখন মনে হইল— এই যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য চেষ্টা— এই যে আমাদের অভুক্ত ভ্রাতাদিগের মুখে অন্ন দিতে এ আকুল উদ্যোগ —এটা কি একটা রহস্য! তাহা না হইলে প্রথমে যাহাদের নিকট হইতে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি নাই, এখন তাহাদেরই সেই মুখের গ্রাসের সংস্থান করিতে এত উদ্যোগ! গোড়া কাটিয়া আগায় জল! তখন আমার নয়ন সম্মুখে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—আমাদের একটা মহাভুল!!

অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি;— কাদা মাড়াইয়া — জল পার হইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি! অশ্বত্থ গাছের নিম্ন দিয়া পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া— বংশকুঞ্জের ভিতর দিয়া— পল্লীগ্রাম-পথে অনেক দূর আসিলাম। পল্লীগ্রামে যাতায়াত আছে সত্য, কিন্তু পল্লীপ্রকৃতির এরূপ বর্ষাগম্ভীরা মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ এতাবৎকাল ঘটিয়া উঠে নাই। স্বল্প মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হাসিমাখা রৌদ্র নাই— বৃক্ষশাখায় বংশকুঞ্জে উৎফুল্ল বিহঙ্গকুলের মধুর কাকলি নাই, অনাকাঙ্ক্ষিত মৃদু সমীরণের হৃদয়োন্মাদী

সরল প্রবাহ নাই। পরিপূর্ণা পুষ্করিণী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া থম্ থম্ করিতেছে, গাছের পাতা বৃষ্টির জলে ঝম্ ঝম্ করিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা তাহাদের সেই একঘেয়েসুরে অনবরত চিঁ চিঁ করিতেছে। প্রকৃতির এরূপ দেহভরা গাম্ভীর্য্য আমি কখনও দেখি নাই

যাইতে যাইতে দেখিলাম, বর্ষার জল পথের পার্শ্বস্থিত নালা-পথ দিয়া সবেগে ছুটিয়া যাইতেছে, একটা দুরন্ত বালক কর্দ্দম লইয়া সেই জলের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিবার অভিলাষে তাহার সম্মুখে বাঁধ দিতেছে! কিন্তু সে বেগের সম্মুখে সে ক্ষীণ বাঁধ কতক্ষণ টিকিবে। একবার বাঁধ দিল, ভাঙ্গিয়া গেল—আবার দিল, আবার ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে সেই বালকের প্রাণব্যয়ী চেষ্টা স্রোতমুখে পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হইয়া গেল। তাহার এই বিফল আয়াস দেখিয়া আমার একটু হাসি অসিল—মনে হইল, শুধু এই বালক কেন, আমরা প্রায় সকলেই এই কুটিল কর্ম্মক্ষেত্রে ইহারই মত বিফল-মনোরথ! বালক যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্রোতমুখে বাঁধ বাঁধিতেছে, সে আকাঙ্ক্ষার সাফল্য কোথায়? বিবিধ প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধ পক্ষে যে সমবেত চেষ্টা, সে চেষ্টা সমবায়ের পুরস্কার কোথায়? সে আকাঙ্ক্ষার সাফল্য নাই—সে চেষ্টার প্রতিদান নাই! ঐ বালক যেমন মুগ্ধ হৃদয়ে প্রবল স্রোতকে নিরুদ্ধ করিবে ভাবিয়া, আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করিয়া স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিতেছে, স্রোত সে শক্তিকে উপহাস করিয়া বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে; কুটিল কালস্রোতের প্রবল আবর্ত্ত ঠিক এইরূপ ভাবেই আমাদের কর্ম্মের বাঁধকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বালকের শক্তি যেমন এই বর্ষাস্রোত

মুখে পরাজিত, আমাদের শক্তিও সেইরূপ কালস্রোতে নিকৃষ্টরূপে পরাজিত। আমার তখন মনে হইল, ঐ বালক যেমন কার্য্যের তৎপরতায় আপনার শক্তিকে বৃথা নষ্ট করিয়া একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছে. সেইরূপ আমাদেরও এই গুরুতর কর্ম্মের অপ্রাকৃত আড়ম্বরের মধ্যে একটা মহাভুল আপনার অধিকার চিরস্থায়ী করিয়া নীরবে বসবাস করিতেছে।

বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "রজনীরঞ্জন রায়ের বাটী যাইব কোন্ পথে ?"

বালক বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি রায়েদের বাটী জানেন না! কোথা হইতে আসিতেছেন আপনি ?"

আমি তদুত্তরে বলিলাম, "আমি কলিকাতা হইতে আসিতেছি, কখনও এ গ্রামে আসি নাই, রায়েদের বাটী আমি জানি না।"

আমার কথা শুনিয়া বালক আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। কেন হাসিল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, তবে বোধ হয় বালকের বিশ্বাস ছিল যে, রজনী বাবুর ন্যায় একজন লোক হয়ত কলিকাতার সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত এবং সকলেই তাঁহার নাম ঠিকানা বিশেষ রূপেই অবগত আছে; আরও হয়ত সে মনে করিত. কলিকাতার ন্যায় সহরে যাহাদের বাস তাহারা জগতের সংবাদ রাখিয়া থাকে; কিন্তু আমি কলিকাতাবাসী হইয়াও রায় মহাশয়ের ন্যায় একজন ধনবান ব্যক্তির বাটী কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহা জানি না।

সুতরাং আমি কি অজ্ঞ ! বোধ হয় এই সমস্ত ভাবিয়াই বালক হাসিয়াছিল। আমি বালকের নিকট আর বিলম্ব না করিয়া তাহার নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর যাইবার পর সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকার সম্মুখভাগে কতকটা জমি, বাগানের মত কেয়ারি করা, ছোট বড় নানাবিধ ফুলের গাছ; বাগানের চতুর্দ্দিক অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উদ্যানে প্রবেশের নিমিত্ত রেলিংবিশিষ্ট একটা গেট আছে। গেট হইতে বরাবর অট্টালিকা পর্য্যন্ত একটা সুরকিমণ্ডিত রাস্তা, যেন অজগর সর্পের মত অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি সেই উদ্যান পার হইয়া সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া সম্মুখের এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনুমানে বুঝিলাম ইহাই রজনী-রঞ্জন রায়ের বাটী।

সে কক্ষটি দপ্তরখানা। মোটা মোটা পায়াবিশিষ্ট কাঠের চৌকির উপর সতরঞ্চি পাতা, তাহার উপর চাদর বিছান;—সে চাদর যে কতদিন রজকভবন দর্শন করে নাই তাহা নিশ্চয়-রূপে জানিতে পুরাতত্বের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। তাহার কোন স্থানে কালি পড়িয়াছে, কেহ তাহাতে চূণ লেপিয়াছে, কেহবা তামাকু সাজিয়া আপনার অপরিষ্কৃত হস্ত সেই চাদর সাহায্যে পরিস্কৃত করিয়াছে; এইরূপে অনেকের অনেক কলঙ্ক আপনার প্রশস্তদেহে নীরবে নির্ব্বিরোধে মাখিয়া সত্যযুগে ক্রয়ের পর হইতে নিশ্চেষ্ট ভাবে সেই চৌকির উপর পড়িয়া রহিয়াছে। চৌকির উপর পাঁচ সাতজন কর্ম্মচারী, সকলেরই সম্মুখে এক একটি বাক্স, তাহার উপর মোটা মোটা খেরুয়া বাঁধান খাতা

লইয়া কেহ হিসাব লিখিতেছে, কেহ হিসাব মিলাইতেছে, কেহ তামাকু টানিতে টানিতে কেবলই পাতা উল্টাইতেছে। তাহাদের ক্রোড়দেশস্থ বাক্স গুলির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তৈল ও সিন্দুরচর্চ্চিত হইয়া তাহারা পুঞ্জীভূত মালিন্যকে যেন নিবিড় প্রণয়ালিঙ্গনে চিরতরে আবদ্ধ করিয়াছে। মেজের উপর আরও তিন চারিজন লোক বসিয়াছিল। আমি যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে একজন — সম্ভবতঃ তিনিই সর্ব্বপ্রধান — তাঁহার সেই চশমাশোভিত নয়নদ্বয় তাঁহার সেই একদণ্ডবিহীন এবং তৎস্থলে সূত্র সংবদ্ধ চশমা তাহার অন্যদিকের জয়েণ্টের মুখে বহুদিন হইতে স্ক্রুটী হারাইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে একটি আলপিন দ্বারা কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চশমার সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র আলপিনের অনধিকার প্রবেশে বাধা দেওয়ায় তাহার মস্তক-সমন্বিত ঊর্দ্ধভাগ মলিন হইয়া যেন সাহেবদের বাবুর্চ্চিখানার চিম্‌নির মত শোভা পাইতেছে —এহেন যে চশমা,— সেই চশমা পরিহিত নয়নদ্বয় আমার দিকে ঈষৎ উন্নত করিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, চশমার উপরিভাগ দিয়া তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হয়?"

আমি বলিলাম,—"আমি কলিকাতা হইতে আসিতেছি ইহাই কি জমিদার রজনীরঞ্জন রায় মহাশয়ের বাটী?"

কর্ম্মচারী "হাঁ মহাশয়, ইহাই জমিদার শ্রীযুক্ত রায় রজনীরঞ্জন রায় বাহাদুরের বাটী। আপনি এখন যে স্থানে উপস্থিত ইহা তাঁহার কাছারী বাটী। মহাশয়ের কি আবশ্যক?"

আমি। আমি কোন কার্য্য বশতঃ একবার রজনীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।

কর্ম্মচারী ধীর ও গম্ভীর ভাবে মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে বলিল,—"উঁ—হুঁ ওটি এখন হইবে না।"

আমি বলিলাম,—"আপনি হয়ত বুঝিয়াছেন, কলিকাতা হইতে এই বৃষ্টিবাদলে আমি এতদূর আসিয়াছি; কাযটা অবশ্য জরুরি, এবার দেখা না হইলে হয়ত পুনরায় আসিয়া আমার সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ নাও ঘটিতে পারে।"

কর্ম্মচারী বিরক্তির স্বরে বলিল,—"কি করিব মহাশয়, এটাত আর আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বাবু এখন বিশ্রাম গৃহে ঘুমাইতেছেন।"

আমিও নাছোড় বান্দা, বলিলাম,—"তিনি যদি এখন প্রকৃতই ঘুমাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু যদি একবার অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয় সংবাদ লয়েন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আমি এই শ্লিপ খানি দিতেছি, কোন লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিন, যদি বাবু জাগ্রত থাকেন, তাঁহাকে ইহা দিতে বলিয়া দিবেন।

আমার কথা শুনিয়া কর্ম্মচারীর অনুগ্রহ হইল না, অধিকন্তু আরও বিরক্ত হইয়া বলিল,—"মহাশয় আপনিত বড় ভাললোক নন আপনার যদি বিশেষ গরজ থাকে তবে ঐ বাহিরে যাইয়া বসুন—আর না হয়—"

মুখের কথা মুখেই রহিল, ঠিক সেই সময়ে একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রৌঢ়—ঠিক প্রৌঢ় নহে তবে যুবকও বলা

যাইতে পারে না, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই কিছু ভীত হইল, আর সেই কর্ম্মচারী যেন একেবারে নিবিয়া গেল। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত গোলমাল কিসের হইতেছিল হে?"

তখন সেই লোকটি, যে আমাকে এতক্ষণ চড়া চড়া কথা শুনাইতেছিল— অতি ধীর নম্রস্বরে বলিল,—"এই ভদ্রলোকটি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন, তা আপনি শুইয়া আছেন অনুমান করিয়া আমরা উহাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিতেছিলাম।"

আমি বুঝিলাম ইনিই রজনী বাবু। রজনীবাবু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি আমাকেই খুঁজিতেছিলেন?"

আমি। আজ্ঞা হাঁ আপনাকেই খুঁজিতেছিলাম।

রজনী। কোথা হইতে আসিতেছেন?

আমি। কলিকাতা হইতে আসিতেছি, আপনার নামে রমণ বাবুর পত্র আছে।

রজনী। কোন্ রমণ বাবু?

আমি তাঁহার পরিচয় দিলে রজনী বাবু আমাকে ডাকিয়া অন্য কক্ষে লইয়া গেলেন। তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমরা একটি বিস্তীর্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। রজনী বাবু আমাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া তাহাতে বসিতে বলিলেন। কক্ষে অনেকগুলি চেয়ার

ছিল, আমি তাহারই মধ্যে একখানিতে বসিবার উদ্যোগ করায় রজনী বাবু বলিলেন,—"ঐ খানিতে বসুন কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে।" যাহা হউক তাঁহারই কথামত রমণ বাবুর পত্র তাঁহাকে দিয়া সেই চেয়ার খানিতে উপবেশন করিলাম; তিনি পত্রখানি লইয়া, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি সোফা ছিল তাহারই উপর উপবেশন করিলেন।

রজনী বাবু পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, আমি সেই অবসরে একবার কক্ষটি দেখিয়া লইলাম। মেজের উপর কার্পেট পাতা, তাহার উপর দূরে দূরে তিনখানি মার্ব্বেল প্রস্তরের টেবিল স্থাপিত রহিয়াছে। প্রত্যেক টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে অনেক গুলি করিয়া চেয়ার। আমি কক্ষের মধ্যস্থিত টেবিলের সম্মুখ ভাগে বসিয়াছিলাম, তাহারই দুইপার্শ্বে আবলুস কাষ্ঠের পীত বর্ণ মখমল-মণ্ডিত সোফা; দেওয়ালগুলি সুন্দররূপে চিত্রিত। স্থানে স্থানে মার্ব্বেলের সাইড বোর্ড ও কর্ণার বোর্ডে সুদৃশ্য শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি ও বড় বড় দর্পণ সজ্জিত রহিয়াছে। কক্ষের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি মেহগ্নি কাষ্ঠের আলমারি। তাহার কোন খানি আগাগোড়া পুস্তকে বোঝাই; পুস্তকগুলির সুদৃশ্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পশ্চাদ্ভাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম—তাহাতে Shakespeare এর সজীবতা রহিয়াছে, Tennyson এর ওজস্বিতা, Wordsworth এর প্রকৃতি অনুরাগ, Bane এর রাজনীতিজ্ঞান রহিয়াছে, Ruskin এর নৈতিকতত্ত্ব রহিয়াছে। অনেকের অনেক রহিয়াছে, কিন্তু সকলই পরের ধন, সকলই

বৈদেশিক। আমাদের আপনার বলিবার কিছুই নাই। আমার বড় ক্ষোভ হইল। ক্ষোভে দুঃখে সে স্থান হইতে নয়ন ফিরাইয়া পার্শ্বের আলমারির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম তাহতে ছোট বড় সরু মোটা অনেক গুলি শিশি রহিয়াছে। কাহারও গলায় ফিতা বাঁধা, কাহারও বুকে ছবি আঁকা, অনেক ধরণের অনেক শিশি রহিয়াছে। পড়িয়া দেখিলাম সকলগুলিই এসেন্সের শিশি, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, ইহারও সকলগুলি বৈদেশিক। কোনটি ফ্রান্সের প্যারিসে, কোনটি ইংলণ্ডের লণ্ডনে, কোনটি জার্ম্মণির কোলনে প্রস্তুত। ভারতের কি কিছুই নাই? কর্ম্মজগতে ভারত কি এতই নিশ্চেষ্ট, এতই নির্জীব?

দেওয়াল গাত্রে দেখিলাম বড় বড় কয়েকখানি তৈলচিত্র রহিয়াছে। এক একখানি করিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখে একটার উপর দৃষ্টি পড়িল। সেটা ঠিক চিত্র নহে, একটা কি লেখা! পড়িয়া বুঝিলাম বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট রজনী বাবুর দানশীলতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন এখানি তাহারই সার্টিফিকেট্! কিন্তু সার্টিফিকেট্কে এরূপ ভাবে বাঁধাইয়া তোষাখানায় রাখিবার উদ্দেশ্য কি! ইহা প্রথমে বুঝিতে আমার একটু কষ্ট হইল—একটু চিন্তার পরেই সমস্যাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। রজনী বাবু কেন যে আমাকে প্রথমে সেই নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে উপবেশন করিতে বলিয়া ছিলেন তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম—কারণ সে চেয়ার খানিতে বসিলে অতি সহজেই তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়

আমার চক্ষে যে এতক্ষণ এখানি পড়ে নাই তাহাতেই আশ্চর্য্য বোধ হইল !

চিন্তা তখন অন্তমুখিনী হইল। আপনার গৌরবকে লোকের নিকট বাড়াইয়া তুলিবার জন্য একি চেষ্টা ! এরূপ নীচ প্রবৃত্তি এরূপ অধম চেষ্টাকে আশ্রয় করিয়া যাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি প্রকৃতই কি সে গৌরবের ন্যায্য অধিকারী ? যে ব্যক্তি প্রকৃত গুণী, তাহার গুণ লোকসমাজের হৃদয়ঙ্গম করাইতে গুণের সার্টিফিকেট্ লোকচক্ষুর উপর এরূপ ভাবে ধরিতে হয় না ! প্রত্যেক সামান্য কার্য্য হইতে কোন অসামান্য কার্য্য পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই সেই গুণের অভিব্যক্তি স্পষ্টই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাঁটি সোনায় গিল্টির আবশ্যক হয় না, সীসার উপরেই রাংতা পাতার আবশ্যক।

রজনী বাবু পত্রখানিকে দুই তিনবার পাঠ করিয়া একটু চিন্তার পর বলিলেন, "রমণবাবু যাহা লিখিয়াছেন—সেটা খুব ভাল কথা। একটা ফণ্ড খুলিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ। উদ্দেশ্যটা অতি মহৎ তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব—দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নিবারণের ভার স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্ট আপনার হস্তে লইয়াছেন—আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় আবশ্যক কি ?"

আমি বুঝিলাম রজনীবাবু দেশবাসীর দুরবস্থার সংবাদ রাখেন

না, কিম্বা তাহাঁর এ বিলাস সেবিত রম্য সংসারোদ্যানে সেই সংবাদ পৌছাইতে পারে না! তাহার সে সুখভোগ্য আহার্য্যের মধ্যে অভুক্ত ভারতবাসীর অনাহার-ক্লিষ্ট হৃদয়ের করুণ অশ্রু বিন্দু নাই! তাঁহার সেই মহামূল্য শয্যার কুসুম-কোমল ক্রোড় দেশে বৃক্ষতলশায়ী দারিদ্রের শিশির-সম্পাত-জনিত আকুল শিহরণ নাই! তাঁহার সে ধনমদমুগ্ধ নিশ্চিন্ত প্রাণের উচ্ছৃঙ্খল হাস্য-প্রবাহের মধ্যে করাল ভবিষ্যতের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে নৈরাশ্য-পীড়িত ভারতবাসীর শূন্য নিশ্বাস নাই! তাঁহার সেই নিশ্চেষ্ট বিলাসময় প্রাণ কেবলই স্বার্থের উপাদানে গঠিত! তাহাতে ত্যাগ নাই, তিতিক্ষা নাই, পরার্থপরতা নাই! সে হৃদয়ক্ষেত্রে আছে কি?—নারকী স্বার্থের বিরাট অধিবেশন!

আমাকে বলিতে হইল,—"আবশ্যক আছে বই কি! গভর্ণমেণ্টের হস্তে দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার আছে সত্য, কিন্তু তাহাই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট? বিশাল ভারতশাসনব্যাপারে ইংরাজরাজাধিরাজের শুধু কেবলমাত্র একটা কর্ত্তব্য নহে—বিবিধ কর্ত্তব্য বিবিধ উপায়ে আপন আপন অস্তিত্বের উপযোগিতা সপ্রমাণ করিতেছে! এরূপ স্থলে সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না!"

আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি, এমন সময়ে রজনী বাবু তাঁহার সেই সোফার উপর এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি শান্ত হউন,—তা হলে আপনি বলিতে চান, গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য-জ্ঞান

নাই! আপনার ন্যায় একজন শিক্ষিতের মুখে এ কথা শুনিয়া প্রকৃতই বড় দুঃখিত হইলাম। ভাল বলুন দেখি, আপনি, এরূপ শক্তি ও শান্তির সমবায় অন্য কোন সম্রাটের আছে কি না? আপনার ইতিহাস পড়া আছে, আপনি বলুন দেখি, বিপুল জনসঙ্ঘ-সংক্ষুব্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ নগর লণ্ডনের রাজপথের কোলাহলময় বিশৃঙ্খলতা আলোকস্তম্ভতল দণ্ডায়মান নিরস্ত্র কেবল এক জন পুলিস কর্ম্মচারীর একটি মাত্র অঙ্গুলি সঙ্কেতের অপেক্ষা করে কি না? কেবল এই একটা নহে এরূপ শত শত উদাহরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতেছে! বলুন দেখি এরূপ নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী অন্য কোন রাজ্যে আছে কি? আর দুর্ভিক্ষের কথা ধরিয়াই যদি এ বিষয়ের মীমাংসা করেন, আপনি কি জানেন না, গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কত উদ্যোগী! প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট আপন আপন বিভাগের উৎপন্ন-শস্য-তালিকা গ্রহণ করেন; তাহার পর আবার শিলা-বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি শস্যের পক্ষে হানিজনক আকস্মিক বিপদ হইতে সাবধানতা গ্রহণের জন্য Meteorological Department রহিয়াছে। যখন দেশে সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন কি গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট থাকেন? প্রথমে Test work এর ব্যবস্থা, তাহার পর যখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতেরা আর খাটিতে পারে না তখন Relief work—"

আমি অধীর হইয়া বলিলাম,—"আপনি এত কথা কেন বলিতেছেন? আমি ত এতকথা বলিবার মত কিছু বলি নাই!

রজনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে আপনি কি বলিতেছেন ?"

আমি—"আমি বলিতেছিলাম কি—আমাদের অনশনের কষ্ট আমরা যতটা বুঝিতে পারি অপরে হয় ত ঠিক ততটা বুঝিতে পারে না ; সুতরাং এ বিষয়ে অপরের যে একটু শৈথিল্য যদি আমরাই অল্প-বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া পূর্ণ করিতে পারি—দেশের ভ্রাতারা যখন অনশনে মরিতে থাকে তখন পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া যদি আমরাই তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করি, তবে সেটা কি একটা সুখের কথা নহে ?"

রজনী বাবু ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বড় একটা বিষম ভুলকে আপনারা প্রশ্রয় দিয়াছেন। বিপুল রাজশক্তির অণুপরমাণু হইয়া আপনারা সেই রাজশক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছেন ; বিশেষতঃ তাহাতে আমরা বাঙ্গালী—একটি গ্রাম্য দেবতার পূজা নির্ব্বাহের সময়েই কত বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকি, আর এটা ত একটা বৃহৎ ব্যাপার! আমার ভয় হইতেছে এতটা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় শেষে একটা 'গোলে হরিবোল' হইয়া বৃথা অপব্যয়িত হইবে !"

আমি। সে সম্বন্ধে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু দেশের গণ্যমান্য লোকসমূহ এ ব্যাপারের এক একটা অংশকে আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। এটা এখন সেপ্টেম্বর মাস যাইতেছে, দুর্ভিক্ষ প্রায় থামিয়া আসিয়াছে—আর যাহা অল্প পরিমাণে আছে তাহার জন্যই এই উদ্যোগ—আমরা

যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার অপেক্ষা অধিক ফললাভ করা গিয়াছে বোধ হয়!

রজনীবাবু। তবে ত কাজ ভাল রকমই চলিতেছে—তা চলিবে বই কি! দেশের যত বড় বড় লোক রহিয়াছেন তাহাতে কাজ ভাল হইবারই কথা,—তবে আর আমাকে কেন এর মধ্যে আনেন? আমরা পল্লিগ্রামের লোক, বুঝেছেন কিনা?—এত গোলমালের মধ্যে আমরা যেতে পছন্দ করি না বুঝেছেন কিনা!—ওরে কে আছিস্ রে!

কক্ষে একজন চাকর প্রবেশ করিল। রজনী বাবু তাহাকে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তোদের কি কোন বুদ্ধি নাই—ভদ্রলোক কতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছেন—তামাকু দিতে হইবে না?"

আমি বলিলাম, "তামাকুর আবশ্যক নাই—আমি উহা ব্যবহার করি না।"

রজনীবাবু। তবে গোবিন্দকে ডাকিয়া এক 'কাপ' চা দিতে বলিয়া দে।

আমি। চায়েরও আবশ্যক নাই, আমি কদাচিৎ চা ব্যবহার করিয়া থাকি।

রজনী বাবু। তা ভাল ভাল—ওরকম কোনটার অভ্যাস না রাখা খুব ভাল। তবে কি জানেন, আমাদের এ পল্লি-গ্রামে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া চা ব্যবহার করিতে হয়। এখানকার জল হাওয়া ত সহরের জল হাওয়ার মত নয় বড় ম্যালেরিয়ার ভয়। আরও একটা কথা, এখানে ওখানে

যাওয়া আসা আছে, লোকের সম্মান রক্ষার জন্যও চা'টা খাইতে হয়।

এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছি, রজনী বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম মহাশয়ের নামটি কি ?"

"শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

রজনী বাবু। আর একটা কথা, দেখুন অবিনাশ বাবু, এ বৎসর ত এই দুর্ভিক্ষ, প্রজারা খাজনা দিতে পারে না—কেহ একবারেই পারিবে না বলিয়াছে, কেহ কায়ক্লেশে অর্দ্ধেক দিয়াছে। কিন্তু রাজা ত আমাদের নিকট হইতে এক পয়সাও ছাড়িবে না। এ বৎসর ঘর হইতে সকল খাজনা দিতে হইবে ; এ দুর্ব্বৎসরে কোন্ দিক রক্ষা করি বলুন। রমণ বাবুর সহিত বাল্যকাল হইতে আমার আলাপ পরিচয় আছে, আর উদ্দেশ্যটাও অতি মহৎ। কিন্তু কি করি বলুন, যে দুর্ভিক্ষের বৎসর। তবে আশ্বিন কিস্তির খাজনা আদায় হইলে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিব ; তাহার এদিকে সুবিধা হইবে না।"

সাফ্ জবাব ! দেশের এতবড় একটা ধনবান্ লোক, দেশের দশজনের নিকট পরিচিত গণ্যমান্য এত বড় একটা 'রায় বাহদুর' দেশের এ বিপত্তি কালে এত উদাসীন থাকিবে এত সাদা কথায় উত্তর করিবে তাহা আমরা মনেই করিতে পারি না। সেই জন্যই ত বলি আমরা যে কল্পনাকে লইয়া

নাড়াচাড়া করি তাহা কেবল কল্পনা ! আমরা যে আশায় বুক বাঁধিয়া জীবিত রহিয়াছি তাহা বুঝি শুধু আশা মাত্র ! তাহা না হইলে যখন সেই আশায় প্রবুদ্ধ হইয়া, গুরু কর্ত্তব্যের বোঝা মস্তকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, যখন জগতের দশজনের একজন হইবার আশায় মুগ্ধ হৃদয়ে কর্ম্মীর পথ অনুসরণ করি, তখন দু'চার পা যাইয়াই পদস্খলন হয় কেন ? কর্ম্মের বিরাট সজীবতার মধ্যে এমন সাংঘাতিক ভুল একান্ত অজ্ঞানিত অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই কেন ?"

আমার আর বলিবার কিছুই নাই। "এখন তবে আমি আসিতে পারি ?"

"আসুন মহাশয়, প্রণাম।"

* * *

রজনীবাবুর একটা কথা এখনও আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা বিরাট শক্তির অণুপরমাণু হইয়া তাহারই সহিত প্রতি-যোগিতায় অগ্রসর হইয়াছি ! একটা অন্ধ-বিশ্বাস-পুষ্ট ভিত্তি-হীন শক্তির সহায়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহি ; ইহাই আমাদের ভুল ! কিন্তু ভুল ছাড়াত কাহাকেও দেখিনা ! আমাদের ভুল রহিয়াছে তোমাদের মধ্যেও ভুল রহিয়াছে ! জগতের সকলের মধ্যেই একটা না একটা ভুল রহিয়াছে ! ভুল লইয়াই বুঝি প্রকৃতির একাংশ ! জন্মের সহিত মৃত্যু যেমন প্রকৃতিগত, আনন্দের সহিত বিষাদ যেমন প্রকৃতিগত, গ্রীষ্মের সহিত শৈত্য যেমন প্রকৃতিগত, আলোকের সহিত অন্ধকার যেমন প্রকৃতিগত, তোমার আমার কর্ম্ম-শৃঙ্খলার মধ্যে সত্যের সহিত ভুলও বুঝি সেইরূপ প্রকৃতিগত ! !

পশ্চিমে

দ্বিতীয় বৃক্ষ-বট।

স্পর্শমণি।

"I do not believe in a religion or God, which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth."

চৈত্র মাসের ঠিক দ্বিপ্রহর বেলা, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, এক এক বার বায়ু বহিতেছে কিন্তু তাহাতে যেন অগ্নিশিখা মাখান! কার সাধ্য সে বায়ু গা' পাতিয়া লয়! বাহিরের দিকে চাহিবার উপায় নাই, চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে! তাহার উপর আবার ধুলা: রাস্তার উত্তপ্ত ধুলা থাকিয়া থাকিয়া ঘূর্ণীর মত উড়িয়া যাইতেছে! এমন সময় কলিকাতার রাজপথে বাহির হওয়াই দুষ্কর!

আমাদের ললিতমোহনও এরৌদ্রে কোথাও বাহির হন নাই। একটি অনতিবৃহৎ দ্বিতল প্রকোষ্ঠ—তাহার দুই পার্শ্বে দুইখানি ছোট খাট, তাহার একখানিতে শুইয়া ললিত মোহন কি একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন; সে পুস্তক যে পাঠ্য পুস্তক নহে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ সে পুস্তক পাঠে তাহার তত মনোনিবেশ ছিল না; তবে অনর্থক বসিয়া থাকা তাহার অভ্যাসের মধ্যে নহে বলিয়াই সেই পুস্তকখানি হাতে ছিল।

দুই তিন দিন হইল কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মাবকাশে দুই মাস ছুটী; এই সুদীর্ঘ দুইটি মাস কেমন করিয়া কাটাইতে হইবে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় তাহারই একটা বাজেট্ মনে মনে তৈয়ারি হইতেছিল। তাহার বন্ধু এবং সহপাঠী শৈলেন্দ্র শীঘ্রই ছুটীতে বাটী যাইবে; আজ তাহারই উদ্যোগ আয়োজনের নিমিত্ত এই মধ্যাহ্নের রৌদ্র মাথায় করিয়া সে বাহিরে বাহির হইয়াছে,—[illegible] ললিত মোহনের বাটী যাইবার ইচ্ছা নাই; কারণ [illegible]তে লইয়া যাইবার মত কোন আকর্ষণ তাহার ছিল না! [illegible]ন যাইবে না কেন? বাটীতে তাহার মা' আছেন, পি[illegible] [illegible]র আছেন, বড় দাদা আছেন, ছোট ভগ্নি আছে—স[illegible]র স্নেহ ও প্রীতি তাহার নিমিত্ত প্রবাসাগমনের প[illegible]তে সঞ্চিত হইয়া আছে! কিন্তু ললিত মোহনের বাটীতে [illegible] সকলের ত কিছুই নাই! শৈলেন বাটী যাইয়া ছোট ভাই[illegible]র মুখ দেখিয়া

আপনি আনন্দ লাভ করিবে,—পিতা মাতার স্নেহ পাইয়া আপনি সন্তোষ লাভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাটীর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, কিন্তু ললিত বাটী যাইয়া আত্মীয়দিগের আনন্দ বর্দ্ধন ত করিতে পারিবেই না, অধিকন্তু কেবল ব্যয় এবং বিরক্তিই বর্দ্ধন করিবে! এ কয় বৎসরের মধ্যে সে যত বার বাটী গিয়াছে, এবং বাটীতে গিয়া যে কয়েক দিন কাটাইয়া আসিয়াছে সে কয়েক দিনের মধ্যে যখনই তাহার অসতর্ক দৃষ্টি বাটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের বদনমণ্ডলে পতিত হইত, তখনই তাহার এতদিনের অভিজ্ঞতা যেন তাহাদের মুখে কেমন একটা অপ্রসন্নতা মাথান বলিয়া বোধ করিত!

শুধু বাটীতে কেন, জগতে ললিতের বড় কোন একটা আকর্ষণ ছিল না! পার্থিব যত কিছু আকর্ষণ ঐ আলমারির মধ্যস্থিত পুস্তকগুলির মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছিল! আর,—তাহার সেই গ্রাম্য পাঠশালার সহাধ্যায়িনী এবং ছাত্রী শৈলবালার কয়েকখানি ভাবহীন ভাষাহীন জীর্ণ পত্রে যেন কি একটা আকর্ষণ মাথান ছিল! কারণ সেই মূল্যহীন কয়েকখানি পত্র ললিতমোহন অতি যত্নে আপনার ট্রাঙ্কের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিয়াছিল! আপনার মূল্যবান ওয়েবেষ্টার ডিক্‌সনারি বাহিরে টেবিলের উপর রাখিয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত;—অতিপ্রিয় "রমিও জুলিয়েট" এবং "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" পুস্তক-দ্বয় খোলা আলমারির মধ্যে রাখিয়া তাহার বিশ্বাস হইত, কিন্তু কি জানি কেন, শৈলের সেই অপরিষ্কার জীর্ণ পত্র গুলি

সে একদিনের জন্যও ভুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখে নাই!

কাহাকেও লুকাইবার মত সে পত্রগুলিতে এমন কোন গোপনীয় কথা লেখা নাই! ললিতের নামে শৈলবালার নিকট হইতে যখনই কোন পত্র আসিত, শৈলেন সে পত্রগুলি খুলিয়া পড়িত। যদি দৈবাৎ কোন পত্র শৈলেনের অনুপস্থিতিতে আসিয়া পড়িত, তবে ললিত, শৈলেন আসিলে পর আপনি সে পত্র পড়িয়া তাহাকে শুনাইত! অতি ছোট ছোট তুচ্ছ কথায় পত্রগুলি পরিপূর্ণ থাকিত! কিন্তু সেই তুচ্ছের মধ্যেও ললিতের কি একটা আকর্ষণ ছিল;—সেইজন্য যখন তাহার কর্ম্মক্লিষ্ট প্রাণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত,—যখন পাঠ ভাল লাগিত না,—ভ্রমণ ভাল লাগিত না,—কথোপকথন ভাল লাগিত না, তখন শয্যায় অবশ অঙ্গ ঢালিয়া, সেই জীর্ণ পত্রগুলির পুনঃ পুনঃ অধীত বিশৃঙ্খল ছত্রমধ্যে ললিতমোহন কি এক চিরমধুর সুধার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিত!!

আমাদের গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অনেক দিনের কয়েকটা পূরাতন কথা বলিয়া রাখি।

রামনগরের রায়েদের বংশ বনিয়াদি বংশ। শ্যামদাস রায়ের পুত্র চন্দ্রকান্ত, নিশিকান্ত, শ্যামকান্ত। চন্দ্রকান্ত রায়ের একমাত্র পুত্র—আমাদের ললিতমোহন। ললিতমোহনের বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর তখন চন্দ্রকান্তের মৃত্যু হয়। দারুণ পতিশোকে ললিতের মাতার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়; পতির মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে তাঁহারও মৃত্যু হয়! তখনও শ্যাম

দাস জীবিত! পুত্রদিগের মধ্যে চন্দ্রকান্তই তাঁহার কৃতী পুত্র ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে বৃদ্ধের জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জর আরও জীর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার উপর পুত্রবধুর মৃত্যু! কিন্তু ললিত মোহনের মুখ দেখিয়া তাঁহাকে সকল শোক ভুলিতে হইল! পিতৃমাতৃহীন বালকের শান্ত মুখমণ্ডল আপনার স্নেহ-কোমল বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইয়া শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া লইলেন।

পাঁচবৎসরের ললিত মোহন গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করিল, প্রথমভাগ শেষ করিয়া ক্রমে দ্বিতীয়ভাগ, তৃতীয়ভাগ বোধোদয় শেষ হইল। ললিত মোহন যখন প্রাতঃকালে বহির্বাটীতে মাদুর পাতিয়া পাঠে বসিত, তখন শৈলের মা তাহার শিশু কন্যা শৈলকে একটুকরা ছিন্ন কাগজ হস্তে দিয়া সেইখানে বসাইয়া দিয়া আপনার কাজে চলিয়া যাইতেন;— বালিকা একই স্থানে নীরবে বসিয়া সেই কাগজ খণ্ড মুখে দিয়া চুষিত, যদি কখনও দেখিত ললিত তাহার দ্রব্য গুলির প্রতি একটু মাত্র অমনোযোগী হইয়াছে, তাহা হইলে শিশু শৈল তাহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত দুইটিকে নিকটস্থ পুস্তক কিম্বা শ্লেটের দিকে অতিশয় দুঃসাহসের সহিত ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিত। তাহার পর ললিত যখন দেখিত, তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারের দ্রব্য গুলি অতি অন্যায় রূপে অপব্যবহৃত হইতে বসিয়াছে তখন সে শৈলকে তিরস্কার করিত, তিরস্কৃত হইলে শৈলের উজ্জ্বল নেত্র স্থির হইয়া থাকিত, লাবণ্যমাখা মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত, ঈষদ্‌রক্তাভ অধরোষ্ঠ উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িত! ক্রন্দনের

পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া ললিত মোহন আবার তাহার হাতে একটা না আর একটা কিছু দিয়া ভুলাইয়া রাখিত!

একাদশবর্ষীয় বালক ললিত মোহন যখন পাঠশালায় যাইত তখন চার বৎসরের বালিকা একখানি রঙ্গিন কাপড় পরিয়া তাহার ললিত দাদার সহিত পাঠশালা যাইবার জন্য কাঁদাকাটি করিত। অগত্যা ললিত তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পাঠশালায় লইয়া যাইত, সেখানে ছিন্ন মাদুরের উপর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার ললিত দাদার পার্শ্বে নীরবে বসিয়া থাকিত!

শৈল যখন পাঁচ বৎসরের হইল, তখন ললিত তাহাকে পাঠশালায় লইয়া যাইয়া 'ক' 'খ' দাগিয়া দিত, প্রথমভাগ হইতে 'অ' 'আ' পড়াইত, হাতের লেখা লিখিবার জন্য তালপাতা কাটিয়া দিয়াছিল,—পেন্‌শিল হারাইয়া যায় বলিয়া শ্লেটের ফ্রেমের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার সহিত সূতা দিয়া পেন্‌শিল বাঁধিয়া দিয়াছিল,—দপ্তর বাঁধিবে বলিয়া কাপড়ের থলি তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিল,—আর শৈল শ্লেট্‌ মুছিবে বলিয়া ভিজা নেতি রাখিবার জন্য দাদামহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার একটা আফিং রাখা পুরাতন কৌটা চাহিয়া লইয়াছিল! ললিত যখন খেজুর পাড়িতে যাইত, শৈল তাহার ছোট আঁক্‌সি গাছটি বহিয়া লইয়া যাইত; যখন কুল পাড়িতে যাইত সে একটি ছোট ঝুড়ি মাথায় করিয়া লইয়া যাইত; আর যখন ললিত যাম পাড়িবার জন্য কোন বড় যাম গাছে উঠিত, তখন শৈল যাম গাছের তলায় ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া, 'আমায় একটি যাম দাও না ললিত দাদা,'

বলিয়া আপনার ক্ষুদ্র বসনের ক্ষুদ্র অঞ্চল যতদূর পারিত বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইত! ললিত এক এক বারে সেই অঞ্চল মধ্যে এক এক গুচ্ছ যাম ফেলিয়া দিত।

তবে ললিত যে তাহার উপর একেবারে অত্যাচার করিত না এমন নহে! পড়ার সময় যখন সে 'ট' কে 'ত' এবং 'ড়' কে 'র' বলিয়া ফেলিত, তখন ললিত তাহাকে একটা বড় রকমের শাস্তি দিবার ভয় দেখাইত; আর তাহার পড়া লইবে না, তাহাকে পাঠ শালায় লইয়া যাইবে না, বলিয়া ভয় দেখাইত; তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না বলিয়া রাগিয়া বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত! কিন্তু ললিতের এ সকল কথা তাহার পর মুহূর্ত্তে মনে থাকিত কিনা সন্দেহ, কারণ তখনই তাহার নীরব ক্রোধ বিদায় হইত, বই খানি কুড়াইয়া আনিয়া আবার তাহাকে পড়া বলিয়া দিত, তাহার পর যখন পাঠশালায় যাইবার সময় হইত, শৈল তখন খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া, কাপড় পরিয়া, দপ্তর লইয়া তাহাদের বহির্দ্বারে কপাটের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিত! অন্যান্য দিন পাঠশালা যাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই দপ্তর লইয়া শৈল ললিতদের বাড়িতে যাইয়া বসিয়া থাকিত, কিন্তু যে দিন প্রাতঃকালে ললিত তাহার উপর রাগ করিত, সে দিন সাহস করিয়া আর তাহাদের বাটীতে না যাইয়া দ্বারের পার্শ্বে অপেক্ষা করিত! তাহার পর ললিত যখন পাঠশালায় যাইবার জন্য বাহির হইয়া,—শৈলের অনুপস্থিতি দেখিয়া —"কোথারে শৈল, পাঠশালায় যাবি আয়"—বলিয়া ডাকিত, তখন ললিতের ডাক শেষ হইবার পূর্ব্বেই শৈল ছুটিয়া আসিয়া

তাহার হাত ধরিত!

অল্পে অল্পে, একটু একটু করিয়া, শৈলের উপর ললিতের এমন একটা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল যে সে কথা ললিতও বুঝিতে পারে নাই, শৈলও জানিতে পারে নাই! যখন তখন, যা' তা' বিষয়ে, ললিত শৈলের উপর হুকুম চালাইত; শৈলও তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিত। এইরূপে ক্রমে এমন হইয়া উঠিল যে, ললিত মনে মনে এইরূপ একটা গর্ব্ব করিত শৈলের উপর তাহার যে কর্তৃত্বের ক্ষমতা আছে তাহার উপর তাহার মায়েরও সে ক্ষমতা নাই।

তাহার উদাহরণ স্বরূপ একদিনের একটা কথা বলি,—ললিত কি একটা ফুলগাছ রোপণ করিতেছে, শৈল তাহাকে ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া দিতেছে, ঝুড়িতে করিয়া মাটী আনিয়া দিতেছে। একবার ঝুড়িতে মাটীর পরিমাণ কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আবার একটা পুষ্করিনীর গর্ভ হইতে সেই মাটী উঠান হইতেছিল! ক্রমোচ্চ পাড়ের উপরে উঠিতে শৈল পড়িয়া গেল; মাথার মাটী চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। ইহাতে ললিত তাহাকে অনেক বকিল, তাহার যে সামান্য মৃত্তিকা আনিবার শক্তিও নাই সে জন্য অনেক গালাগালি করিল, শৈল ললিতের মুখের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করিল! পড়িয়া গিয়া তাঁহার হাঁটু ছিঁড়িয়া গিয়াছিল তাহা সে তখন মোটেই অনুভব করিতে পারে নাই, তখন তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে কেবল এই কথাই বাজিয়া উঠিতেছিল,—

তাহার এই সামান্য মৃত্তিকা আনিবার শক্তি কেন নাই,— বুঝি এ শক্তি না থাকাই তাহার অপরাধ,— বুঝি প্রকৃতই সে কত অপরাধী তাহা না হইলে তাহার ললিত দাদা বকিবে কেন!

এরূপ একটা দুটা নহে, অনেক ঘটনা রামনগরে তাহাদের বাল্যজীবনে ঘটিয়াছিল, তাহা তাহাদের কেহই মনে করিয়া রাখে নাই! কারণ এরূপ মর্ম্মবেদনার পরেই শৈল তাহার খেলা ঘরে পুতুলের বিবাহে ধুলার পরমান্ন কচু পাতার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইত, ললিত সাগ্রহে সে নিমন্ত্রণে যোগদান করিত! শৈলের খেলা ঘরে এরূপ নিমন্ত্রণ তাহারই একচেটিয়া ছিল!!

সমস্তদিনের পর সন্ধ্যার সময় যখন শৈলের মাতা তাঁহাদের মেটে ঘরের রকে আসন পাতিয়া মালা জপিতে বসিতেন, তখন ললিত ও শৈল দুইজনে তাঁহার ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিত, এবং তাঁহাকে রূপকথা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। মাতা জপ শেষ করিয়া তাহাদের এই প্রাত্যাহিক সান্ধ্য দাবীকে পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতেন। এক এক দিন এক এক রকমের গল্প হইত, কোন দিন বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর গল্প, কোন দিন শুক শারীর গল্প, কোন দিন আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্প, কোন দিনবা আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যুর গল্প হইত! গল্প শুনিতে শুনিতে বালকবালিকা দুই জনেই ঘুমাইয়া পড়িত!

পরিস্ফুট নীলিমাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া আকাশে

অনন্ত কৌমুদী হাসিতেছে,—নীরব প্রকৃতির বুকে নৈশ অন্ধকার জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া যেন হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছে,—দূরে নিকটে বৃক্ষগুলির শিরোভাগ জোনাকি-মণ্ডিত হইয়া যেন রত্ন তরুর মত শোভা পাইতেছে! গম্ভীরা নৈশ প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল ঝিল্লিঝঙ্কার সুরতানলয়ে মানব শ্রবন পূর্ণ করিতেছে! উদাস পবন দিগ্‌দিগন্তে তাহার প্রতিধ্বনি লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে! আকাশে কৌমুদী হাস্য, ধরাতলে সেই সুধাধবল জ্যোঃতির স্নিগ্ধ আচ্ছাদন, বৃক্ষ শিরে জোনকির অনন্ত স্ফুরণ, দিগন্তে ঝিঁঝিঁর গম্ভীর ঝঙ্কার, থাকিয়া থাকিয়া উদাস পবনের মুক্ত প্রবাহ!

প্রকৃতি রাণীর এই সমস্ত মনোহারিত্বের মধ্যে একাকিনী জননী চন্দ্রকরস্নাত বালকবালিকার মুখমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। জননীর অভয় পরিপূর্ণ ক্রোড়দেশে বালক বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইত! তাহাদের সুন্দর উজ্জ্বল পাশাপাশি দুইখানি মুখ জননী দেখিয়া দেখিয়া নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না! নৈশ-সমীরণ-সেবিত হইয়া নিদ্রিত বালকবালিকার চিন্তা-শূন্য শীতল ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম জমিয়া উঠিত, মা' আপনার অঞ্চল দিয়া ধীরে ধীরে তাহা মুছাইয়া দিতেন! নিদ্রিতাবস্থায় বালকবালিকার প্রীতি-প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে সুখময় স্বপ্নরাজ্যের হাস্যরেখা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, দেখিতে দেখিতে জননীর আনন্দাশ্রু আপনা আপনিই ঝরিয়া পড়িত!

তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিতেন,—"হে ভগবন,

এ অভাগিনীর অন্য কোন প্রার্থনা নাই, কেবল এই করিও, যেন এই বালকবালিকা চিরজীবন পরস্পরে আত্মনির্ভর করিয়া এই রূপে সুখময় নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করে!” ভাগ্যহীনা বিধবার এ কাতর প্রার্থনা বিধাতার স্বর্ণ-সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিত কিনা জানিনা, কিন্তু সহায়হীনা সম্পত্তিহীনা অনাথিনীর অন্তর্দৃষ্টি শৈলের লাবণ্যমাখা সমুজ্জ্বল ললাটদেশে ভবিষ্যৎ কালের জন্য কেবলই মসীময় অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত!

ললিত পাঠশালায় পড়া শেষ করিয়া গ্রামান্তরে এক এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হইল। শৈল তখনও পাঠশালায় বোধোদয় পড়িতে লাগিল। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে ললিত অতিশয় সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এবং মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিল। শ্যামদাস রায় ললিতকে কলিকাতা পাঠাইয়া তাহার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ললিত কলিকাতা যাইবার দিন শৈল ও তাহার মাতার নিকট বিদায় লইতে আসিল। তখন শৈলও তাহার ললিত দাদার সহিত কলিকাতা যাইবে বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার মা অনেক ভুলাইলেন, কিন্তু সে বুঝিল না, তাহার পর যখন তিনি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে কলিকাতা সহর তাহাদের ন্যায় দরিদ্রের বাস করিবার জন্য নহে, তখন শৈল তাহার সেই ছল ছল উজ্জ্বল নয়ন দুইটিকে ললিতের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল। ললিত সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মাকে বলিল, “আমি কলিকাতায় রহিলাম, আপনি মাঝে মাঝে শৈলকে

লইয়া কলিকাতায় যাইবেন সেখানে দুই চারি দিন থাকিয়া গঙ্গা স্নান কালিদর্শন করিয়া পুনরায় বাটী আসিবেন, শৈল তুমি সেই সময় মায়ের সঙ্গে কলিকাতা যাইও!

শৈ। সে আমরা কবে যাব?

ল। আমি গিয়ে চিঠি লিখিব।

শৈ। তুমি তবে গিয়েই চিঠি লিখো।

ল। আমিত লখিবই, কিন্তু তুমিও লিখো, মা কেমন থাকেন, তুমি কেমন থাক, যেন সংবাদ পাই; আর আমি যখন বাটী আস্‌ব তখন আমি দেখতে চাই তোমার বোধোদয় শেষ হয়ে গেছে আখ্যানমঞ্জরী ধরেছ!

শৈল ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। আজ তাহার মুখে বেশী কথা আসিতেছিল না। আজ তাহার ললিত দাদা কলিকাতা চলিয়া যাইবে, তাহার ললিত দাদার সহিত খেলা করিতে পারিবে না, আর বেড়াইতে পাইবে না এইবার হইতে সে একাকী হইবে! এই রূপ বিবিধ চিন্তা তাহার হৃদয় মধ্যে কেমন একটা মৃদু যন্ত্রণার সৃষ্টি করিতেছিল; অনেক চেষ্টাতেও তাহা হইতে সে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না! আজ যতক্ষণ পারিল ললিতের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল, তখন শৈল ললিতের বইগুলিকে এক এক খানি করিয়া গুছাইয়া দিল, কাপড় গুলিকে ভাঁজ করিয়া দিল, বিছানা পত্র বাঁধিবার জন্য দড়ি আনিয়া দিল। তাহার পর ললিত স্নান করিতে গেল, শৈলও তাহার সহিত স্নান করিতে

গেল, অন্যদিন স্নান করিতে যাইয়া শৈল কত সাঁতার দিত কত দৌরাত্ম্য করিত, কিন্তু আজ আর সে সব কিছুই হইল না. আজ. তাহার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না, তাহার মন ভারী ভারী, মুখ গম্ভীর, চক্ষু ছল ছল। ললিত যদি তাহার মুখের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকে তাহা হইলে সে ছল ছল চক্ষু আরও ছল ছল হইয়া উঠে! সেইজন্য আজ ললিতও যেন চেষ্টা করিয়াও শৈলের সহিত বেশী কথা বলিতে পারিতেছিল না!

স্নান শেষ করিয়া ললিত বাড়ী অসিল ; শৈলও বরাবর পিছনে পিছনে আসিল।

ললিত বলিল, "শৈল, কাপড় ছাড়বি না ?"

শৈল, "কাপড় রোদে শুকিয়ে গেছে!"

ললিত। ভাত খাবি না ?

শৈল। মায়ের এখনও রাঁধা হয় নাই।

তাহার পর মা যখন শৈলকে ভাত খাইবার জন্য ডাকিলেন, তখন শৈল বলিল, 'ক্ষিদে নাই !'

আহারাদি শেষ করিয়া ললিত দাদা মহাশয়ের সহিত ষ্টেশনাভিমুখে যাত্র করিল। শৈল দাদা মহাশয়ের হস্ত হইতে ছোট ব্যাগটি কাড়িয়া লইয়া আপন কক্ষে তুলিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। প্রথমে শ্যামদাস বাবু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না, তখন বালিকা ব্যাগ লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল!

প্রথমে বাহক মোট মাথায় করিয়া চলিয়াছে, তাহার পর শ্যামদাস বাবু, তাহার পর ললিত, পশ্চাতে শৈল ব্যাগটিকে

কোলে লইয়া চলিতে লাগিল। গ্রাম্যপথে অনেক দূর আসিয়া পড়িলে শ্যামদাস বাবু শৈলকে আর তাহাদের সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু শৈল সে কথা শুনিল না ;—তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। ক্রমে সকলে যখন গ্রাম পার হইয়া মাঠে আসিয়া পড়িল, তখন ললিত বলিল ;—"শৈল আর আসিস্ না বাড়ী যা।"

ললিত ব্যাগ লইবার জন্য হাত বাড়াইল, বালিকা আর কিছুই না বলিয়া নীরবে তাহার হাতে ব্যাগটি দিল। ব্যাগ লইবার সময় ললিত শৈলের মুখের দিকে একবার চাহিল, দেখিল, ছল ছল চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছে ; ললিত আর সেখানে বিলম্ব করিল না, সত্বর মুখ ফিরাইয়া দাদা মহাশয়ের সঙ্গ লইল, পাছে শৈলের ক্রন্দন দেখিয়া, তাহার চক্ষে জল আসে।

সকলে চলিয়া গেল ; শৈল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল ! যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল একদৃষ্টে ললিতের দিকে চাহিয়া রহিল, ক্রমে যখন সকলে অনেক দূর যাইয়া পড়িল, আর লোক চিনিতে পারা যায় না, তখনও সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, নীরব প্রান্তরে আপনাকে একাকিনী পাইয়া তাহার কান্না বেশী করিয়া আসিল, সে অনেকক্ষণ সেই রৌদ্রে দাঁড়াইয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল !

যাইতে যাইতে ললিত দুই তিন বার ফিরিয়া দেখিল। ললিত যত দূর হইতে লাগিল শৈলের ক্রন্দনও তত বাড়িতে

লাগিল। পরিশেষে যখন আর ললিতকে দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন শৈল অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে বাটী ফিরিয়া আসিল।

বাটীতে আসিয়া শৈল তাহার পুতুলগুলি পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে বিলাইয়া দিল; খেলাঘরের হাঁড়িবেড়ি প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল! পড়াশুনায় আর তাহার সেরূপ মন রহিল না। প্রতিদিন আর সকালে বই লইয়া সেরূপ পড়িতে বসে না,—পাঠশালায় আর বড় যাইতে চাহিত না। যেদিন মা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতেন সেই দিনই কেবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠশালায় যাইত। লিখিবার তালপাতা ঘুঁটের মাচার উপরে ইঁদুরে কাটিতে লাগিল! পড়িবার বই গুলি এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাইত: মা সেগুলি একস্থানে গুছাইয়া রাখিতেন। মাসী-মার নিকট শৈলের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া উঠিল,—সে দৌরাত্ম্যে কেবল ক্রন্দন ও অভিমানেরই আধিক্য থাকিত!

সন্ধ্যার সময় মায়ের নিকট শৈল আর সেরূপ গল্প শুনিতে বসিত না। প্রদীপের সলিতা বাড়াইয়া দিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে হাতের লেখা লিখিবার জন্য ললিত তাহাকে যে দাগা লিখিয়া দিয়াছিল সেই দাগা লইয়া লিখিতে বসিত। ললিতের কলিকাতা গমনের পর হইতেই শৈলের লেখাপড়ার মধ্যে কেমন একটা অযথা শৈথিল্য আপনার অসাধারণ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছিল! মায়ের তিরস্কারে যখনই সে আপনার বই গুলিকে খুঁজিয়া লইয়া পড়িতে বসিত, তখনই কেমন একটা সঙ্গীহীনতার ভাব কেমন একটা নিরানন্দের ভাব তাহার স্মৃতিকে মথিত করিয়া

হৃদয়ের সমস্ত স্থানটুকু জুড়িয়া বসিত! পুস্তক পাঠ করা, নামতা মুখস্থ করা, অঙ্ক কষা, প্রভৃতি পড়াশুনার যন্ত্ররূপ অঙ্গ শৈলের নিকট কেবল মাত্র লিখন কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল! কারণ তাহার [illegible] আছে, ললিত দাদা কলিকাতা যাইবার সময় তাহাকে পত্র লিখিবার জন্য বলিয়া গিয়াছে, সুতরাং দুই দিন পরেই হউক আর দশ দিন পরেই হউক, ললিত দাদার পত্র আসিলেই তাহাকে পত্র লিখিতে হইবে, সেইজন্য সে এখন হইতে প্রস্তুত হইতেছে!

দশ বার দিন পরে শ্যামদাস বাবু বাটী ফিরিয়া আসিলেন। পৌত্রের নিকটে থাকিতে তাঁহার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাটীতে আসিতে হইল। কিন্তু ললিতকে একাকী রাখিয়া বাটীতে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব! সেইজন্য এই বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম-পীড়িত প্রাণের উপর আবার আর একটা কর্ম্মের বোঝা বাড়িয়া গেল! কিন্তু সে কর্ম্ম সম্পাদনে হৃদয়ে অবসাদ আসিত না, বরং অবসন্ন প্রাণ উৎসাহিত হইয়া উঠিত। যখন হাতে আর অন্য কোন কায থাকিত না, যখনই তিনি আপনাকে অবসরপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ করিতেন তখনই সে অবসরকে অন্য কার্য্য দ্বারা বাধিত করিয়া লইতেন; সে কার্য্য কি?—কলিকাতা যাইয়া ললিতকে দেখিয়া আসা! এই কারণে শ্যামদাস বাবু মাসে দুইতিন বার কলিকাতা যাইতেন।

শ্যামদাস বাবু প্রথম বার কলিকাতা হইতে আসিয়া শৈলকে তাঁহাদের বাটীতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; তাহার জন্য মিষ্টান্ন

আনিয়াছিলেন দিলেন, একখানি রংকরা কাপড় আনিয়াছিলেন দিলেন, দুইটি কাচের পুতুল আনিয়াছিলেন দিলেন, আর সর্ব্বশেষে ললিতের ঠিকানা লেখা কতকগুলি খাম দিয়া বলিলেন, "এ খাম গুলি ললিত তোমাকে দিয়াছে আর বলিয়া দিয়াছে, তুমি যেন এই খামে করিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে পত্র দাও। পত্র লিখিয়া এই খামের মধ্যে আঁটিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিও, ইহাতে টিকিট লাগাইতে হইবে না,—দেওয়া আছে; আর এই ধর, সে তোমাকে একখানা পত্র দিয়াছে!"

শৈল কাপড়, মিঠাই, খেলনা লইয়া গিয়া একস্থানে জড় করিয়া রাখিয়া দিল। সদাশোভনীয় মিষ্টান্নের মিষ্টত্ব কিরূপ তাহ দেখিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল না,—কাচের খেলনা গুলি কত সুন্দর এবং মনোহারী, এরূপ পুতুল যে এতদিন তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, এ কথা অনুভব করিবার তাহার অবকাশ হইল না, তাহার কাপড় খানির নূতনত্ব প্রতি সূতায় সূতায় ভাসিয়া উঠিতেছে,—এরূপ উত্তম কাপড় তাহার পরিধানে এই প্রথম, এবং দর্শনেও এই প্রথম! ইহা বুঝিয়াও আনন্দ করিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠিল না! এ সমস্তকে তুচ্ছ করিয়া সে তাহার ললিত দাদার পত্রখানিকে লইয়া তাহাদের ঘরের রকে বসিয়া খুঁটিতে হেলান দিয়া পা' ছড়াইয়া পড়িতে বসিল! মা সেদিন শৈলকে দিয়া আর কোন কাব পাইলেন না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটাতেও পত্রপাঠ শেষ হইল না; তাহার পরদিন প্রাতঃ-কালও ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল! পঠনকার্য্য শেষ হইলে পত্র লিখন

কার্য্যের সূত্র পাত হইল। অনেক কষ্টে কয়েক খণ্ড কাগজ যোগাড় করিয়া শুষ্ক প্রায় কালীর দোয়াতে একটু জল ঢালিয়া লইয়া, খাগড়ার ভোতা কলমটাকে একটু ভাল করিয়া কাটিয়া ঘসিয়া লইয়া লিখিতে বসিল। প্রথম বার কালী পড়িয়া কাগজ নষ্ট হইয়া গেল, দ্বিতীয় বার প্রথম ছত্রেই তিন চারিটা কাটা কাটি হওয়ায় সে কাগজ খানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তৃতীয় বার একটা লিখিতে আর একটা লিখিয়া ফেলিল। এই রূপে কাগজ গুলি একে একে নষ্ট হইয়া যখন আর এক খানিতে ঠেকিল, তখন শৈল অনেক যত্নে একটু একটু করিয়া সমস্ত দিনে পত্র লেখা শেষ করিল। সে পত্রে কালীর কলঙ্ক রহিল, হাতের মালিন্য রহিল, কলমের কাটা ছেঁড়া রহিল, ছত্রের বিশৃঙ্খলতা রহিল শব্দের অপপ্রয়োগ রহিল, ভাষায় ভুল রহিল, এতগুলি আত্মীয়কে আপনার প্রশস্ত বক্ষে ধারণ করিয়া পত্র খানি ললিতের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল! আমারা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি ললিত কিন্তু সে পত্রে নন্দনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল, পারিজাতের সুষমা আঘ্রাণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।

ললিতের বিশেষ অনুরোধে দুই বৎসরের মধ্যে শৈলের মা শৈলকে লইয়া দুই তিন বার কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে দুই এক দিন থাকিয়া গঙ্গা স্নানাদি শেষ করিয়া আবার বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা যাইবার সময় শৈলের কত আনন্দ, দুই দিন হইতে তাহার উদ্যোগ আয়োজন হইত,— আপনার মলিন বস্ত্র খানিকে আপন হস্তে কাচিয়া লইত, জীর্ণ জামাটির

ছিন্নাংশ আপন হস্তে শেলাই করিয়া লইত, ললিত দাদাকে দেখাইবার জন্য হাতের লেখার খাতাখানিকে কাপড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া লইত, কলিকাতা যাইবার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে বাটীতে তাহার নিজস্ব দ্রব্যগুলিকে ব্যবস্থা করিয়া রাখিত, যেন সে কত দিনের জন্য সে সকল ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতেছে!

যে দিন শৈল কলিকাতা যাইয়া পৌঁছাইত, সে দিন সন্ধ্যাকালে ললিতের আর পড়াশুনা কিছুই হইত না। সন্ধ্যার সময় ললিত যখন পড়িবার জন্য বই লইয়া বসিত সেই সময় শৈল সমস্ত দিনের পর তাহাকে পাইয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিত, এবং পুস্তকের ছবি দেখিতে দেখিতে রামনগরের কথা হইত। ললিতের কলিকাতা চলিয়া আসার পর হইতে শৈলের নিরানন্দ দিনগুলি কেমন করিয়া কষ্টে কষ্টে কাটিয়া গিয়াছে, সে কথা, সে তাহাকে একটু একটু করিয়া বলিত! যদিও শৈলের বর্ণনা সেরূপ ভাবপ্রকাশক ছিল না, তাহার মুখের কথায় তাহার হৃদয়ের সমস্ত কথা ফুটিয়া উঠিত না,—তাহার ললিতহীন গ্রামাজীবনের মর্ম্মবেদনা তাহার কথায় ভালরূপ বুঝিতে পারা যাইত না, কিন্তু ললিতের নিকট এ সকল কিছুই গোপনীয় ছিল না। শৈলের সম্বন্ধে তাহার এমনই একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া ছিল যে, সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এক একটি করিয়া মুখমণ্ডলের প্রত্যেক শিরাকে স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিত, চক্ষু দুইটীর প্রতি স্নায়ুকে বিভিন্ন করিয়া পাঠ করিতে পারিত, সেই জন্য শৈল যখন তাহার গ্রাম্য জীবনের সাময়িক ইতিহাস বলিত তখন সেই ইতিকথা তাহার

লুক্কায়িত মর্ম্ম বেদনাকে ললিতের নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিত !

এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। শ্যামদাস বাবু মাসে দুই তিনবার কলিকাতা যাইয়া পৌত্রের সংবাদ লইতেন। দাদা মহাশয় আসিলেই ললিত সর্ব্বাগ্রে শৈলের সংবাদ লইত। বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একটি অনাথিনী প্রতিবেশিনী বাল্যসহচরীর প্রতি ললিতের এ স্নেহাধিক্য দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন ; তিনি ললিত ও শৈলের ভবিতব্যকে আপনার ইচ্ছানুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে এক নবীন ভাবে নবীন জীবনে লইয়া আসিবেন স্থির করিয়া ছিলেন ; কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানে তাঁহার সে ইচ্ছা কালস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় উপেক্ষিত হইয়াছিল !

ললিতের ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিবার সময় আসিল। পরীক্ষার সময় শ্যামদাস বাবু কলিকাতা আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু কর্ম্মের বাহুল্য ও শারীরিক সামান্য অসুস্থতা নিবন্ধন আসিতে পারিবেন না বলিয়া ললিতকে লিখিয়া জানাইলেন। আরও লিখিলেন তাঁহার অসুস্থতা সামান্য, সেজন্য চিন্তা করিয়া যেন তাহার পড়া শুনার ক্ষতি না হয়। যেদিন পরীক্ষা শেষ হইবে সেই দিনেই যেন ললিত বাটী চলিয়া আসে, রাত্রে ষ্টেশনে লোক থাকিবে। ললিত পত্র পাইয়া একেবারে যে চিন্তিত হইল না এমন নহে। এতদিন পর্য্যন্ত তাহার দাদা মহাশয় অনেকবার

কলিকাতা আসিয়াছেন ; সামান্য বাধা বিপত্তি তাঁহাকে এত দিন পৌত্রমুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত করাইতে পারে নাই, এবং পারিবে না, একথা ললিত ভালরূপেই বুঝিত। সেই জন্য তাহার একবার মনে হইল, যে কর্ম্মের বাহুল্য তাহার দাদামহাশয়কে এই পরীক্ষার সময় তাহার নিকট আসিতে দিল না—সে কিরূপ কর্ম্ম? যে শারীরিক সামান্য অসুস্থতা এসময়ে তাহার দাদাকে তাহার নিকট আসিতে দিল না—সে কেমন সামান্য অসুস্থতা? এসময় দাদামহাশয় থাকিলে তাহার হৃদয়ে কত উৎসাহ বাড়িত, বুকে কত বল বাড়িত! কিন্তু ললিত মোহন এসমস্ত চিন্তাকে তুচ্ছ করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লইল। পাঠব্যাপারে মানসিক চাঞ্চল্য ভাসিয়া গেল।

যে দিনে পরীক্ষা শেষ হইল, সেই দিনেই সন্ধ্যাকালে ললিত বাটী রওনা হইল। প্রাতঃকালে 'বাটী যাইতেছি' বলিয়া দাদা মহাশয়ের নামে ললিত এক টেলিগ্রাম করিয়াছিল, আর তিনিও রাত্রে ষ্টেশনে লোক রাখিবেন বলিয়া পূর্ব্বপত্রে জানাইয়াছিলেন। সুতরাং রাত্রে যাইবার কোন বাধা ছিল না। গাড়ী হইতে নামিবার দুই তিনটা ষ্টেশন পূর্ব্বে আকাশে মেঘ করিয়া আসিল,—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল,—হু হু বায়ু বহিতে লাগিল,—সূচীভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া পড়িল,—ধরণী দুর্য্যোগময়ী হইল!

ললিত যখন গাড়ী হইতে নামিল তখন ঝড়ের সহিত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। প্লাট্‌ফরমে আলোক নাই, ষ্টেশনে লোকজন নাই, কেহ তাহার টিকিটের সংবাদ লইল না। ষ্টেশনের বাহিরে

আসিয়া দেখিল, দোকানীরা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে. একখানি দোকানও খোলা নাই। ললিত অনেকক্ষণ এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু রামনগরের কোন লোককেই দেখিতে পাওয়া গেল না! বসিবার আশ্রয় নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই;—বৃষ্টিতে আর কতক্ষণ এরূপে ভিজিতে পারা যায়? সে একবার মনে করিল এই অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টিতে সঙ্গীহীন হইয়া কেমন করিয়া বাটী যাইব,—ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে যাইয়া রাত্রি কাটাই! কিন্তু আবার মনে হইল, কলিকাতা হইতে এতদূর আসিয়া এইটুকুর জন্য তাহাকে রাত্রে ষ্টেশনে থাকিতে হইবে?—তাহা কখনও হইতে পারে না! আজ সপ্তাহেরও অধিক হইল তাহার দাদা মহাশয়ের আর কোন সংবাদ পায় নাই। শারীরিক অসুস্থতা সংবাদ দিবার পর ললিত তাহার দাদার এরূপ সুদীর্ঘ নীরবতা আর কখনও দেখে নাই! কলিকাতায় থাকিয়া পরীক্ষার গোলমালে এসকল কথা সে মোটেই মনে স্থান দেয় নাই! কিন্তু ষ্টেশনে নামিয়া যখন দেখিল তাহাকে লইবার জন্য কোন লোকই আসে নাই;—সে টেলিগ্রাম করা সত্বেও তাহার দাদা মহাশয় কোন লোকই পাঠান নাই;—ইহার কারণ কি? ঝড়বৃষ্টির জন্য যে কোন লোক আসিতে পারে নাই একথা তাহার মনে কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। তাহার স্নেহ-সেবিত প্রাণের মধ্যে কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিন্তা একেবারে উথলিয়া উঠিতেছিল! শারীরিক অসুস্থতা সংবাদ দানের পর দাদা মহাশয়ের এরূপ সুদীর্ঘ নীরবতা কেমন একটা আশঙ্কাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল।

আর দাঁড়াইয়া ভাবিবার সময় নাই,—আকাশে মেঘ আরও জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে, পূঞ্জীভূত অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে, বৃষ্টি বেশী করিয়া আসিল, আর অপেক্ষা করা চলেনা! কিন্তু একটা আলোক,—আলোক ব্যতিরেকে এ অন্ধকারে কেমন করিয়া এতটা পথ চলা যাইবে! কিন্তু আলোক কে দিবে? দোকানদার ঝাপ বন্ধ করিয়াছে, পান্থেরা নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছে! এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সে কাহার নিকট আলোক চাহিবে? কোন রূপে একটা আলোক সংগ্রহের চেষ্টায় অগত্যা ললিত ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন ষ্টেশন মাষ্টারের এ্যাসিসটেণ্ট মহাশয় লাইন ক্লিয়ার দিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ললিতের প্রশ্নে তিনি যেরূপ অসভ্য ভাষায় উত্তর দিলেন, তাহাতে সে স্থানে আর কোনরূপ সাহায্য লাভের আশা নাই জানিয়া ললিত বাহির হইল!

যদিও ললিতের পথ ঘাট ভালরূপই জানা ছিল, তথাপি এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া গমন করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার! কিন্তু তথাপি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণপ্রভার সাহায্যে পথ চিনিতে চিনিতে অল্পে অল্পে ললিত চলিতে লাগিল! আধঘণ্টার পথ চলিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিল! ললিত যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন দেখিল, দূরে প্রান্তর মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। সহসা গম্ভীর হরিধ্বনি সেই ভীষণতাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল! আজ কোন সংসার-পীড়িত জীব

শ্মশান সৈকতে জীবন ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে! তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

ঐ তাহাদের বাটী দেখা গেল; ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আলোকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সুউচ্চ শ্বেত চূড়া তীব্র আলোকে চক্‌-মক্‌ করিয়া উঠিল! ললিতের মনে হইল এই পথটুকু ছুটিয়া যায় কিন্তু পা' উঠে না কেন? বক্ষঃস্থল আবার কাঁপিয়া উঠিল। ছুটিয়া যাইয়া বহির্দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল "দাদা—দাদা—দাদা!" দ্বার সংলগ্ন লৌহ শৃঙ্খল ভীষণ প্রতিহত হইয়া গভীর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। বাতায়ন বিনির্গত ক্ষীণ আলোকরশ্মি বুঝি প্রাচী-রের বিপরীত গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া উপরের অন্ধকারকে কিছু তরল করিয়াছিল, বৃষ্টির পতন শব্দের সহিত বুঝি অস্পষ্ট মানব কণ্ঠ-স্বর এক একবার শুনা যাইতেছিল কিন্তু ললিতের সাড়া পাইয়া সে স্বর স্তব্ধ হইল, বাতায়ন রুদ্ধ হইল। ললিত আবার ডাকিল "দাদা—দাদা—দাদা!" শূন্যে প্রতিধ্বনি হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল!

ললিত আর দাড়াইতে পারিল না। পথ পর্য্যটন শ্রান্ত, বায়ুবৃষ্টি-পীড়িত প্রাণ এ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না! ধীরে ধীরে অবসন্ন মস্তককে দ্বারের উপর রক্ষা করিয়া, আবার ডাকিল "দাদা!"

একখানি কোমল হস্তের স্পর্শ তাহার পৃষ্ঠে অনুভূত হইল ললিত চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল,—এক মূর্ত্তি! অন্ধকারে সে মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিল না। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

অস্পষ্ট মূর্ত্তি মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল 'আমি শৈল'।

"শৈল! এত রাত্রে এখানে তুই! তোর চক্ষে কি ঘুম নাই? দাদা ঘুমাইয়াছেন, কাকা ঘুমাইয়াছেন, চাকর লোকজন সকলে ঘুমাইয়াছে, আমাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য, আমাকে ডাকিয়া ঘরে লইবার জন্য কেহই জাগিয়া নাই! কিন্তু তুই! তুই এখনও জাগিয়া আছিস! এ দুর্দ্দিনে দুর্য্যোগে জগৎ ঘুমাইয়াছে—আর তোর চক্ষে ঘুম নাই—তুই জাগিয়া আছিস!"

"তুমি আজ বাড়ী আসবে, টেলিগ্রাম করেছিলে; তোমার অপেক্ষায় জাগিয়া ছিলাম। এতক্ষণ আমার ঘুম আসে নাই।"

"দাদা কেমন আছেন—শৈল?"

"আমার সঙ্গে এস—বলিতেছি।"

ললিত নীরবে শৈলের পশ্চাদনুসরণ করিল তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, বজ্র গর্জ্জিতেছে। শৈলের সহিত যাইতে যাইতে ললিত ভাবিতেছিল আমার জন্য শৈলের এত বেদনা কেন—পূর্ব্বজন্মে শৈল আমার কে ছিল—বুঝি আমার অন্ধকারের আলোক! সেই জন্য আজ এই দুর্দ্দিনে এই অন্ধকারে আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমিও যেন এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারি। ঈশ্বর না করেন যদি কখন শৈলের জীবনে অন্ধকার নামিয়া আসে—সে অন্ধকারে যখন সে পথ চিনিতে পারিবে না—চলিতে পারিবে না—তখন যেন আমি এই রূপভাবে তাহার জীবনান্ধকারে আলোক লইয়া আসিতে পারি পথহারা শৈলকে পথ চিনাইয়া দিতে পারি!

*   *   *

শ্যামদাস বিনা রায়েদের সংসার চলিবে না কেন—লোকে মনে করিত শ্যামদাস মরিলে রায়েদের সংসার বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে কিন্তু লোকের সেটা বুঝিবার ভ্রম! পূর্ব্বে সংসার যেমনটি ছিল এখনও ত সেরূপ রহিয়াছে! তবে ধ্রুবতারাহারা হইয়া সাগর-বক্ষে কুহেলিকা-ভ্রান্ত তরণীর যে দশা হয়, রায়পরিবারের জীবন-তরণী গুলিরও বুঝি সেই দশা হইয়াছিল,—তাহারা দিশাহারা পথহারা হইয়াছিল,—সুপথ ছাড়িয়া কুপথে আসিয়া পড়িয়াছিল।

ললিত মনে করিত দাদার স্নেহ ব্যতীত তাহার জীবন ধারণ একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু সেটা ঠিক নহে, কারণ যদিও তাহার দাদার মৃত্যুর পর প্রথম কয়েক দিন দারুণ শোকে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর ততটা রহিল না। জীবনযুদ্ধে এইরূপ শত শত আঘাত সহ্য করিতে হয় সুতরাং এই প্রথম আঘাতেই অভিভূত হইলে চলিবে না, এইরূপ বিবিধ বিবেচনার পর প্রাণকে অনেকটা সহিষ্ণু করিয়া লইল। সমস্ত দিনটা অন্যমনস্কে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত বাটীতে একদণ্ড দাঁড়াইতে পারিত না। বাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলে যে দিকে যে পদার্থের উপর দৃষ্টি পড়িত, তাহারই অস্থি মজ্জায় তাহার দাদার স্মৃতি গ্রথিত বলিয়া মনে হইত। দেখিতে দেখিতে তাহার কত দিনের কত কথা মনে পড়িয়া যাইত,—সে সকল অতী-তের সুখময় স্মৃতি মনে পড়িলে চক্ষে আপনি জল আসিয়া পড়িত। সেই জন্য দুই বেলা আহারের সময় ব্যতীত ললিত প্রায় বাটীতে

আসিত না। সকাল বেলা শৈলকে লইয়া পড়াইতে বসিত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শৈলের মায়ের সহিত বৃথা গল্পে সময় কাটাইত, অপরাহ্নে কোন দিন সমবয়স্ক দিগের সহিত হাডুডু খেলিবার জন্য মাঠে যাইত, কোন দিন বা শৈলকে লইয়া বনে বনে বাগানে বাগানে ফুল বেল পাড়িয়া বেড়াইত।

শ্যাম দাস বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। ইদানীং যদিও শ্যাম দাস বাবু আপনার বুক পাতিয়া সংসারের সকল দিক রক্ষা করিতে ছিলেন কিন্তু তথাপি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন তাহার দিন ফুরাইয়াছে। মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরিয়া উঠিত, বুকের মধ্যে কোন একটা বেদনা অনুভব করিতেন, চক্ষে সমস্ত অন্ধকার বলিয়া বোধ হইত! এই সমস্ত কারণে তিনি আপনাকে আর অধিক দিন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যদি কর্ত্তব্যকে অসমাপ্ত রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় এক উইল প্রস্তুত করিলেন। সে উইলের বৃত্তান্ত ললিত বাটী আসিয়া লোকপরম্পরায় সমস্তই শুনিয়াছিল। তাহাতে জমিদারী ও স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ ললিতের নামে লিখিয়াদিলেন, এবং অপর দুই অংশ নিশিকান্ত ও শ্যামকান্তের নামে রহিল। তিনি তাঁহার পুত্র দুইটিকে ভালরূপেই চিনিতেন; সেইজন্য তাঁহার অবর্ত্তমানে ললিতমোহনকে তাহাদের নিকট কোন বিষয়ে প্রতারিত হইতে না হয় উইলে তাহার সকল ব্যবস্থাই রহিল। তাহার পর এবার ললিত পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিলে তাহার বিবাহ দিয়া আপনার শেষ কর্ত্তব্যকে

সমাপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন স্থির করিলেন ; কিন্তু মানব যাহা মনে করে তাহাই কি কখনও পূর্ণ হয়।

যেদিন ললিতের শেষ পরীক্ষা, সেই দিন প্রাতঃকালে শ্যামদাস বাবু পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া আসন ত্যাগ করিবেন অমনি মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি ভূমে পড়িয়া গেলেন, সংজ্ঞা লুপ্ত হইল! সে লুপ্ত সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না, মধ্যাহ্নকালে একবার চেতনা হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া স্নেহের প্রাণের ললিতকে শেষ দেখা দেখিতে ইচ্ছা হইল। নিশিকান্তকে ললিতের নিকট টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। উভয় ভ্রাতায় তখন গোপানে গোপনে আর একটা পরামর্শ আঁটিতেছিল, লোকলজ্জা ভয়ে টেলিগ্রামের ফরম লেখা হইল বটে কিন্তু সে টেলিগ্রাম কলিকাতা পৌছিল না, জ্যেষ্ঠের পরামর্শ অনুসারে শ্যামকান্ত টেলিগ্রাম পত্রখানা পথে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। সেই দিন সকালে ললিতও "বাটী যাইতেছি" বলিয়া দাদার নামে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, সে সংবাদ বেলা দুইটার সময় আসিয়া পৌছিল, তখন নিশিকান্ত ও শ্যামকান্ত মনে করিতে লাগিল, ললিত না আসিতে আসিতে এ বৃদ্ধ শীঘ্র শীঘ্র মরিলে হয়,—এ আপদ শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইলে হয়! ইহাইত সংসারের যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি! ইহাইত সংসারের প্রকৃত রীতি! তুমি যাহাদিগকে চিরকাল আপনার বক্ষঃরক্ত দিয়া পোষণ করিয়াছ, তাহারাই একদিন তোমার মৃত্যু কামনা করিবে, তোমার জীবন নাট্যাভিনয়ে যবনিকা পতনের জন্য

তাহারাই আবার প্রধান উদ্যোগী হইয়া উঠিবে! স্বার্থময় কুটিল সংসারের ইহাই চিরন্তন প্রথা।

রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তাহাকে লইয়া নিশি ও শ্যাম কেহই শ্মশান ঘাটে যায় নাই। পুত্রেরা মুখাগ্নি করিবে অন্তিমের এ সৌভাগ্যও বিধাতা বৃদ্ধের ভাগ্যে লিখেন নাই, ললিত আসিয়া যখন বহির্দ্বারে "দাদা দাদা" বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইতেছিল তখন দুই ভ্রাতায় এক নিভৃত কক্ষে নগদ টাকা কড়ি ভাগ করিয়া লইতেছিল, কেমন করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হইতে ললিতকে বঞ্চিত করিবে তাহারই কূট পরামর্শ আঁটিতে ছিল!

একমাস পরে শ্যামদাস রায়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু সে শ্রাদ্ধে রামনগরের রায়েদের মত কিছুই হইল না। লোক মনে করিয়াছিল শ্রাদ্ধটা হয় দানসাগর আর না হয় বৃষোৎসর্গ ব্যাপারে সুসম্পন্ন হইবে। চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সামাজিক বিদায় ব্যাপারে ভাল রূপেই লাভবান হইবে আশা করিয়াছিল, দরিদ্রেরা মনে করিয়াছিল শ্যামদাস রায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা দুইদিন পেট পূরিয়া মাছ ভাত খাইতে পাইবে কিন্তু কাহারও মনোমত কিছুই হইল না। কোন ব্রাহ্মণই সামাজিক বিদায় পাইলেন না, অনাহূত কাঙ্গালীরা আসিয়া যখন পাত পাড়িয়া বসিল, তখন কাহারও পাতে ভাত পড়িল ত ডাল পড়িল না, ডাল পড়িলত ভাত পড়িল না, ললিত ক্ষুৎপীড়িত কাঙ্গালীদিগের 'দাও' 'দাও' শব্দ শুনিয়া

আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, শৈলের মায়ের নিকট যাইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। মনের আশা মনে রহিয়া পেটের ক্ষুধা পেটে লইয়া কাঙ্গালীরা গৃহে ফিরিয়া গেল। এইরূপে নিশিকান্ত ও শ্যামকান্ত তাহাদের পিতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিল!

ললিতের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। এবারেও সে যোগ্যতার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল এবং বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা রহিল। ক্রমে স্কুল কলেজ খুলিয়া আসিল। ললিত পড়াশুনা করিতে কলিকাতা যাইবার জন্য একদিন অপরাহ্নে খুড়া নিশিকান্তের নিকট কথা পাড়িল।

নিশিকান্ত বলিলেন "তাইত ললিত, কলিকাতা যাবি, একা থাকবি! আগে বাবা ছিলেন মাসে দু' তিন বার যেতেন তিনি মারা গেলেন এখন তোর কলিকাতায় কেমন করে থাকা হয়?"

ললিত। কলিকাতায় এতদিন একাইত ছিলাম, দাদা মাঝে মাঝে যেতেন বইত নয়! আর লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থাত চাই।

নিশি। আর বেশী লেখাপড়াতে কাজ কি বাবা, যা শিখেচ তাই যথেষ্ট! এখন বাড়িতে থাক খাও দাও কাযকর্ম্ম কর বস্।

ললিত। তা কি করে হতে পারে শিক্ষার এখন অনেক বাকি। এত শীঘ্র শীঘ্র লেখাপড়া ছাড়া কোন মতেই হতে পারে না।

নিশি। আর একটা কথা কি জান ললিত, কল্‌কাতায় থেকে লেখা পড়ায় বাটিভাড়া, বামুন চাকর, স্কুলের মাহিনা, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতিতে বিস্তর খরচ পড়ে যায়। এত দিন ভিতরের সংবাদ ঠিক জানা ছিল না, বাবা মারা যাবার পর

এখন যা দেখ্‌ছি তাতে মাসে মাসে এই ৭০।৮০ টাকা বাজে খরচ কর্‌তে পারা যাবে বলে বোধ হয় না।

বাজে খরচ! ললিতের শিক্ষার নিমিত্ত অর্থব্যয়—বাজে খরচ! খুড়ামহাশয়ের এই বাক্য ললিতের মর্ম্মে বিঁধিল তাহার দাদা মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। ললিত এই দুই বৎসর যে বৃত্তি পাইয়াছে তাহা হইতে তাহার দাদা মহাশয় একটি পয়সাও খরচ করেন নাই, সে টাকা এত দিন তাহার নামে পোষ্টাপিসে জমিতেছিল। তিনি সমস্ত ব্যয়ই সম্পত্তির আয় হইতে চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ললিত আজ একি কথা শুনিল! সে যে তাহাদের বৈষয়িক অবস্থা একেবারে জানিত না এমন নহে। তাহার দাদা মহাশয় জীবিতাবস্থায় অনেক সময় তাহাকে অনেক কথা বলিতেন, সময়ে সময়ে দুই একটা বৈষয়িক পরামর্শও জিজ্ঞসা করিতেন। এত দিন তাহারা যে বাহিরে কাহারও নিকট ঋণী আছে একথা সে কখন কাহারও মুখে শুনে নাই। তাহা ছাড়া তাহাদের জমিদারীর বাৎসরিক আয় ৩০।৩২ হাজার টাকা। তবে ইহারই মধ্যে কেমন করিয়া ভিতরের সংবাদ এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, তাহার লেখাপড়ার জন্য মাসিক ৬০৲টাকা ব্যয় বহন করিতে রায় পরিবার অক্ষম! তখন তাহার মনে হইল, খুড়া মহাশয়ের মুখে এই যে তাহার লেখাপড়ার প্রতিবন্ধকের কথা শুনিল ইহা রায় পরিবারের আর্থিক অক্ষমতা নহে,—তাহারই দুর্ভাগ্য,—যেহেতু তাহার দাদা মহাশয় মারা গিয়াছেন!

অভিমানে ললিতের মুখে কথা আসিল না। চক্ষের জল

চক্ষে গোপন করিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে উঠিল, এবং যেখানে শৈলের মা মাদুর পাতিয়া কাঁথা শেলাই করিতে ছিলেন সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। "এস বাবা এস" বলিয়া মা তাহাকে বসিবার জন্য আপনার মাদুরের কতক অংশ ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু ললিত মাদুরে না বসিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাটীতে ধুলায় উপরেই বসিয়া পড়িল। মা তখন সুচ সূতা ফেলিয়া ললিতের মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, তাহার বদনের উজ্জ্বল আভা পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, নয়নের বিমল জ্যোঃতি মলিন হইয়া গিয়াছে! আরও দেখিলেন, তাহার প্রাণের মধ্যে করুণ ক্রন্দনের লহরী একটা অব্যক্ত যাতনার সহিত হুড়াহুড়ি করিয়া নয়ন পথে বাহিরে আসিবার চেষ্টা পাইতেছে; কিন্তু কঠোর আত্মশাসন সে ক্রন্দনকে চাপিয়া রাখিয়াছে! ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা ললিত, কি হয়েছে?"

ললিত সমস্ত কথা বলিল, বলিতে বলিতে রুদ্ধ উৎস খুলিয়া গেল। মা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক সান্ত্বনা করিলেন, পরিশেষে রায়েদের কুলপুরোহিত যজ্ঞেশ্বর শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা বলিতে বলিলেন, তিনি যদিকোন রূপে নিশিকান্ত ও শ্যামকান্তকে বুঝাইয়া সম্মত করাইতে পারেন। ললিত তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিল। শিরোমণি মহাশয় ললিতের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন, সেই দিনেই নিশি-

কান্ত ও শ্যামকান্তের নিকট উপস্থিত হইয়া ললিতের শিক্ষা বিষয়ে তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন উইল অনুসারে ললিতও বিষয় সম্পত্তির তুল্যাধিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে তাহাদিগকে মৃদু গঞ্জনা ও তিরস্কার করিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার এ অনধিকার চর্চ্চার ফল শীঘ্রই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। শ্যামদাস বাবু তাঁহাকে কয়েক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমী দিয়াছিলেন। ৫।৭ দিনের মধ্যে সকলে জানিতে পারিল, জমিদার নিশিকান্ত ও শ্যামকান্তের তরফ হইতে শিরোমণি মহাশয়ের নামে ঐ সকল জমির ৩ বৎসরের বাকী খাজনার নালিশ হইয়াছে। ললিত তখন খুল্লতাতদিগের নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহারা কিন্তু অটল অচল! আত-পান্নভোজী শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণের এরূপ স্পর্দ্ধা একান্ত অসহ্য! সে ক্ষেত্রে ললিতও বাদ পড়িল না। নিশিকান্ত ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপুহে, আমাদিগের নিকট হইতে তুমি আর কোনরূপ আশা করিও না। তোমার বাপ নিতান্ত আহাম্মক লোক ছিল, তোমার জন্য কিছু রাখিয়া যায় নাই আর তোমার দাদা বার মাসে তের পার্ব্বণ করে, দান ধ্যান করে, অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ সেবা করে, বিষয়টাকে একেবারে নষ্ট করে গেছে সেই জন্য তোমাকে আমরা আর কোনরূপ সাহায্য করতে পারব না।" তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, আপনার দেখে শুনে করে কর্ম্মে নাওগে।"

ললিত কাঁদতে কাঁদিতে বলিল, "আমার জন্য আপনা-

দিগকে আর অনুরোধ করব না; কিন্তু এই ব্রাহ্মণ আমারই জন্য বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন যদি তিনি কোন অন্যায় করে থাকেন এইবারের মত সে ত্রুটী সংশোধন করিয়া লউন।'

নিশিকান্ত সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন, "তা হবে না, ও বেটা কত বড় পাজির পাজি, আমি একবার দেখে নেব, বড় স্পর্দ্ধা বেড়েছে বেটার ভিটায় ঘুঘু চরাব তবে আমার নাম নিশিকান্ত।

ললিত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া শিরোমণি মহাশয়ের বক্ষে মুখ লুকাইল, সে সময় তাঁহারও চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ললিতের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "দাদা ললিত, কাঁদিও না, ইহার জন্য দোষী কেহই নহে, কাল, ধর্ম্মবশতঃ এ সমস্ত ঘটিতেছে। পুণ্যের সংসারে পাপ ঢুকিয়াছে ধর্ম্মে ইহা সহিবে না. রায়পরিবার উৎসন্ন যাইবে। কিন্তু দাদা, তোমাকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর করুন দীর্ঘজীবী হইয়া কীর্ত্তিমান হও, রায় বংশের মুখোজ্জ্বল কর!" বৃদ্ধের অশ্রুজলে ললিতের মস্তক আর্দ্র হইয়া গেল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে সন্ধ্যাকালে শৈলদের ঘরের রকে বসিয়া ললিত শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল; তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে ছিল। নিকটে শৈল বসিয়াছিল। ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেও মাঝে মাঝে অঞ্চল দিয়া আপনার অশ্রু মুছিয়া ফেলিতেছিল! ললিত আপনার বিপর্য্যস্ত অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কাঁদিতেছিল আর শৈল ললিতের ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতেছিল! এই রূপে অনেক-

ক্ষণ কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ললিত বলিল "শৈল, কাল আমি কলকাতায় যাব"।

"কালকেই যাবে এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

"আর এখানে থাকিয়াই বা কি করিব ? যদি পড়াশুনা করিতে হয় তার একটা ব্যবস্থা চাই, আর যদি পড়াশুনা না হয় তবে কোন রকম কায কর্ম্মের চেষ্টা করিতে হইবে এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন ?"

সে কথায় শৈল আর কোন উত্তর না করিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর শৈল তাহার বিষাদক্লিষ্ট বদন খানিতে একটা নিবিড় চিন্তার মীমাংসাজনিত স্বস্তির ম্লান রেখা ফুটাইয়া বলিল "আচ্ছা ললিত দাদা, এক কায করিলে হয় না ?"

"কি কায শৈল ?"

"আমি ছোট বেলায় যে সোণার বালা হাতে পরিতাম, এখন ছোট হওয়ায় মা খুলিয়া রাখিয়াছেন, সেইটা কেন বিক্রয় করিয়া তুমি পড়ার খরচ চালাও না, সে বালাত এখন আর আমাদের কোন কাযেই লাগেনা !

শৈলের কথা শুনিয়া এ দুঃখের সময়েও ললিতের মুখে হাসি আসিল। সে মনে মনে বলিল যে হতভাগ্যের শিক্ষার ব্যয় রামনগরের রায়েদের জমীদারির আয়ে সঙ্কুলান হয় নাই, একটি দরিদ্রা বালিকা তাহার ক্ষুদ্র অলঙ্কার-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে তাহাই সম্পূরণ করিতে চায় ! ললিত তখন দেখিতে পাইল,—এই স্বার্থ

সংক্ষুব্ধ জগতের মধ্যে একজনের অকপট নিঃস্বার্থতা তাহার প্রাণের জ্বালাকে অনেকটা কমাইয়া রাখিয়াছে, এই মরীচিকা-দগ্ধ সংসারের দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে একটা আশার মোহন সুরকে মাঝে মাঝে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, নৈরাশ্য ও দৈন্য-পীড়িত কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে এখনও একটা রত্ন তাহার গর্ব্ব করিবার আছে! সেই রত্ন, শৈলের মাতার প্রাণঢালা আশী-র্ব্বাদ, শৈলের অপার্থিব বন্ধুত্ব!

ললিত বলিল "শৈল, যদি আমার অদৃষ্টে থাকে তবে লেখা পড়ার ব্যবস্থা আমি আপনা হইতেই করিয়া লইতে পারিব, আমার জন্য তোমাকে এত ভাবিতে হইবে না!"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে শৈল ললিতের দিকে চাহিয়া রহিল! ললিতের জন্য তাহাকে ভাবিতে হইবে না, একথার কোন অর্থই সে খুঁজিয়া পাইতে ছিল না।

পরদিন আহারাদি সমাপ্ত করিয়া ললিত সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। পথে বাহির হইয়া দেখিল, একজন আদালতের পেয়াদা ঢোল সহরৎ করিতে করিতে যাইতেছে; গ্রামের একদল বালক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গোলযোগ বাড়াইয়া চলিয়াছে। ললিত শুনিতে পাইল যজ্ঞে-শ্বর শিরোমণির বাকী খাজনার দায়ে পরশ্ব তারিখে প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির নিলাম হইবে। ঘোষণা শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর এই অত্যাচার! ইহারই নাম কি রাজরোষ অথবা দৈবনিগ্রহ।

কলিকাতা যাইবার সময় একবার শিরোমণি দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। ললিত যখন তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে আসিয়াছে, তখন দেখিতে পাইল শিরোমণি মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী দুইজনে পথে বাহির হইয়াছেন ললিত তাঁহাদিগকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। শিরোমণি মহাশয় তাহার মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি শুভ হউক!"

"দাদা মহাশয়, কলিকাতা যাইবার সময় আপনাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। গ্রামে ঢোল সহরৎ হইতেছে শুনিয়াছেন কি?"

"শুনিয়াছি বই কি দাদা, আমাদের এই পথ দিয়া বাটীর সম্মুখ দিয়া ৫।৭ বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁকিয়া হাঁকিয়া গিয়াছে।"

"উপস্থিত কিছু টাকা ঋণ করিয়া বাকি খাজনার ডিগ্রীটা পরিষ্কার করিলে হইত না, তাহার পরে সে ঋণ পরিশোধ করিবার একটা উপায় করা যাইত।"

"দরিদ্রকে কে সাহায্য করিবে, কে রায়েদের কোপানলে পড়িতে সাহসী হইবে? আর এ সকলের আবশ্যকই বা কি দাদা! যাঁহার সেবার জন্য বিষয় সম্পত্তি তিনিই যখন ইহাতে সন্তুষ্ট, তখন আর আমোদের অসন্তোষের কারণ কি? আজই আমি সস্ত্রীক গ্রাম পরিত্যাগ করিতেছি, আর আকর্ষণই বা কি রহিল! আকর্ষণের মধ্যে এক পৈত্রিক শালগ্রাম! আমরা যদি দুইবেলা দুই মুঠা আহার পাই, তবে অগ্রে তাহা তাঁহাকে উৎ-

সর্গ করিয়া প্রসাদ পাইব,—সেই শালগ্রামকে সঙ্গে লইয়াছি। দিন কয়েকের মধ্যে কাশী যাইব স্থির করিয়াছি। জগত যদি আমাকে ভুলিয়া যায় তথাপি আশা করি এ দরিদ্রের কথা তুমি কখনও বিস্মৃত হইবে না।

ললিত নয়নের তপ্ত অশ্রুকে নয়নে গোপন করিয়া সত্বর সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কলিকাতা আসিয়া সহপাঠী দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার মধ্যে শৈলেন্দ্র নাথ মিত্রের সহিত তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রণয় ছিল। শৈলেন্দ্রও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়া শুনা করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহার পিতা হুগলি জেলার একজন জমীদার। তাহাদের অর্থের কোন অভাব ছিল না। শৈলেন্দ্র যখন ললিতের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কথা শুনিল তখন আপনার নিকটেই তাহার পড়া শুনার ব্যবস্থা করিয়া লইল। শৈলেন্দ্রের পিতা পুত্রকে মাসে মাসে বাসা খরচ বাদে ১৫৲ টাকা করিয়া দিতেন সেই অর্থ হইতেই ললিতের কলেজের মাহিনা দেওয়া হইবে স্থির হইল। ললিত এই অকৃত্রিম বন্ধুর এই নিঃস্বার্থ দান গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিল। কিছুদিন পরে বৃত্তির সংবাদ প্রকাশিত হইলে জানা গেল ললিত এবারেও বৃত্তি লাভ করিয়াছে; কিন্তু শৈ[illegible] তাহাকে সে [illegible] হইতে কিছুই করিতে দিল না। [illegible] অধ্যয়ন [illegible] আহার বিহারে দিন কাটিয়া যাইতে [illegible]

একে একে অনেক দিন [illegible]। [illegible] মধ্যে মধ্যে

শৈলের পত্রে রামনগরের সংবাদ পাইত, কিন্তু তাহার খুড়া মহাশয়েরা তাহার কোনরূপ সংবাদ লইতেন না। ইতি মধ্যে অনেক ছুটী গিয়াছে কিন্তু ললিত বাটী যায় নাই বা বাটী যাইবার কোন আবশ্যকতা বোধ করে নাই। পূর্ব্বে যদিও তাহার দাদা মহাশয় মাসে দুই তিন বার কলিকাতা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেন এবং রামনগরের সমস্ত সংবাদ দিয়া যাইতেন তথাপি বাটী যাওয়ার পক্ষে প্রায় কোন ছুটীই বাদ পড়িত না। রামনগরের প্রত্যেক ক্রীড়া ক্ষেত্র, প্রতি আম জাম গুবাক-বৃক্ষ, প্রতি পথ ঘাট মাঠ, তাহার পর আবার শৈল, তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে এমন একটা আকর্ষণের বুনন বুনিয়া রাখিয়াছিল যে কলেজের ছুটী হইলেই সব বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে তাহার বাটী যাইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিত! কিন্তু এখন তাহার সেই আকর্ষণের বুননের মধ্যে এমনই একটা জোট পাকাইয়া গিয়াছিল যে, সে অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিয়াও তাহা আর সরল করিয়া লইতে পারিল না; অধিকন্তু যত দিন যাইতে লাগিল সে জোট ততই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল! আত্মাবমাননার নিকট রামনগরের দগ্ধ স্মৃতি মুছিয়া যাইতেছিল, শৈলের অপরিমেয় স্নেহ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর যখন পূজা আসিল তখন শৈল তাহাকে বাটী আসিবার জন্য অনেক মিনতি করিয়া অনেক দেবতার দিব্য দিয়া পত্র লিখিল। ললিত সে আকুল আহ্বানকে আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু বাটী যাইয়া যেন সে বড়

বিপদে পড়িল। বাটীতে পূজা মহোৎসবে সকলেই ব্যস্ত ; সেই ব্যস্ততার মধ্যে ললিত যে অনেক দিনের পর বাটী আসিয়াছে, একথা যেন কেহ অনুভব করিবারও সময় পাইল না। সেই মহোৎসবের মধ্যে ডুবিয়া, আনন্দ রাশির মধ্যে ঘুরিয়া ললিত যখন কণা মাত্র আনন্দের সন্ধান পাইল না, তখন ছুটিয়া আসিয়া দরিদ্রা শৈল-জননীর চরণতলে প্রণত হইয়া তাঁহার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ ও হাস্যমাখা সম্ভাষণকে মস্তকে লইয়া একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভূম্যাসনে বসিয়া পড়িল।

ললিত যে কয় দিন বাটীতে ছিল সেকয় দিন তাহার আহারাদি ও শয়ন প্রায় শৈলদের বাটীতেই চলিয়া ছিল ; কিন্তু এই আচরণে তাহার খুল্লতাতেরা যে শৈলদের উপর সমধিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে। ছুটী শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বেই ললিত কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার কয়েকমাস পরে মধ্যম খুল্লতাতের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অনাহূত হইয়াও আপন কর্ত্তব্যবোধে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল! কিন্তু গিয়া দেখিল তাহার যাওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক হইয়াছে! পীড়ার ঝঞ্ঝাটে সেও যেন এক মূর্ত্তিমান ঝঞ্ঝাট রূপে তাহাদের মধ্যে একটা নীরব গোলযোগ বাধাইয়া তুলিয়াছে! দুই তিন দিন পরেই ললিত কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছিল, আর বাটী যায় নাই। এই সুদীর্ঘ প্রবাসবাসে রামনগরের সকলেই তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে—কিন্তু শৈল ভুলিতে পারে নাই! নিবিড় অশান্তি ও

অবিচ্ছিন্ন হাহাকারের মধ্যে ইহাই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা !

অনেকদিনের পর গ্রীষ্মের ছুটী আসিয়াছে। শৈল ছুটীতে ললিতকে বাটী যাইতে লিখিয়াছিল, কিন্তু ললিত আগত প্রায় পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা প্রভৃতি নানা কারণে এবার বাটী যাইতে পারিবে না এই কথা জানাইয়াছে। সহপাঠী শৈলেন্দ্র নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিল, বাটী যাইবার জন্য কতরূপ উদ্যোগ আয়োজন পড়িয়া গেল। শৈলেন্দ্র ললিতকে সঙ্গে লইবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইল, কিন্তু ললিত বারান্তরে পরীক্ষা শেষ করিয়া শৈলেন্দ্রের দেশ দেখিয়া আসিবে স্বীকার করায় সেবারের মত পরিত্রাণ পাইল।

রাত্রে যখন তাহারা দুইবন্ধুতে আহারে বসিয়াছে তখন ডাক হরকরা বাহিরের দরজার কড়া নাড়িয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল আহারাদি শেষ করিয়া ললিত পত্রের শিরোনামায় দেখিল, শৈলের হস্তাক্ষরে তাহারই নাম লেখা। ভিতরের দিকে দেখিল যে শৈল তিন চারি পাতা লিখিয়াও তাহার পত্র শেষ করিতে পারে না আজ সেই শৈল এতবড় পোষ্ট কার্ড খানার মধ্যে তিনটি কি চারিটি কথা লিখিয়াছে। প্রথমে সে লেখাটাকে মোটেই পড়িয়া উঠিতে পারিল না ; তাহার পর আলোকের নিকট ধরিয়া দেখিল তাহাতে কেবলমাত্র লেখা আছে :—ললিত দাদা মায়ের বড় অসুখ, তোমায় দেখিতে চাহেন, শীঘ্র বাটী আসিবে। পত্র পাঠ করিয়া ললিত শৈলেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। শৈলেন্দ্র বলিল "নিশ্চয় পীড়া সাংঘাতিক হইয়াছে, বালিকা বড় বিপদে

পড়িয়াছে, হয়ত উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা কিছুই হইতেছেনা, তুমি এখনই বাটী যাও!” কিন্তু রাত্রে আর ট্রেন ছিল না। পরদিন প্রত্যুষে শৈলেন্দ্রও বাটী যাইবার ব্যবস্থা করিল। তখন দুই বন্ধুতে আশা ও আশঙ্কা, আনন্দ ও উদ্বেগমথিত দুইরকমের প্রাণ লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিল।

ললিত রামনগর যাইয়া দেখিল, শৈলদের ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উজ্জল গৃহ খানিকে শোকের ছায়ায় একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। শৈল ও তাহার মাসী শৈলের মায়ের মৃত-দেহের পার্শ্বে বসিয়া আকুল ক্রন্দন করিতেছে। সেই কাতর ধ্বনি শূন্য গৃহে কেবল শোকের ছায়াকে গাঢ়তর করিয়া তুলি-তেছে! ললিতকে দেখিয়া তাহাদের ক্রন্দন চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহাদের সেই ক্রন্দনের হাহাকারের সহিত অদূরে নব-জাত শিশুর জন্মোৎসব উপলক্ষে গভীর বাদ্য কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল; সে বাদ্যধ্বনিতে বুঝি কেবল মৃত্যুর প্রতি কঠোর উপহাসের হাসি বাজিয়া উঠিতেছিল!

গত কল্য প্রাতঃকালে শৈলের মায়ের বিসূচিকা রোগে মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার সৎকারের কোন উপায় হয় নাই। শৈলের মাসী লোকের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়া-ছেন কিন্তু সে আর্ত্ত ক্রন্দনে কাহারও দয়া হয় নাই! সক-লেই বিবিধ কারণ দর্শাইয়া সে বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। দুই একজন স্পষ্টভাষী ইহাও প্রকাশ করিয়াছে যে রায়েদের নিষেধেই এ বিষয়ে তাহারা কোনরূপ সাহায্য

করিতে সাহসী নহে। বৃদ্ধা রায়েদের নিকট যাইয়াও কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। নিশিকান্ত শুনিয়াছিল শৈলের মায়ের অসুখ বলিয়া ললিতের নিকট পত্র গিয়াছে এই সংবাদ তাহাকে ক্রোধে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। বৃদ্ধা যখন তাহার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল, তখন দ্বারবান দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিবার আদেশ হইল। ললিত সমস্ত শুনিয়া ভিন্ন গ্রামের লোকের সাহায্যে শৈলের মাতার সৎকার করিল।

সময়ান্তরে মাসীর নিকট ললিত শৈলের মায়ের রোগ ও মৃত্যুসম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা অনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিল। ললিতের সহিত শৈলের বিবাহের কথা বলিবার জন্যই যে তাহার দিদি মৃত্যুকালে ললিতকে দেখিতে চাহিয়া ছিলেন একথাও মাসী বলিলেন। তিনিও এ বিবাহে সম্পূর্ণ অনুমোদন ও অনেক অনুরোধ করিলেন। সহায়শূন্যা সম্পত্তিশূন্যা অভিভাবকশূন্যা বালিকার সেই একমাত্র আশা ভরসা, এখন শৈলকে বিবাহ করিয়া তাহার সদ্গতি লাভের উপায় তাহাকেই করিতে হইবে!

ললিত ভাবিল, ইচ্ছা করিলেই সে এখন শৈলকে বিবাহ করিয়া আপনি সুখী হইতে পারে, কিন্তু শৈলের তাহতে কি সুখ! যদিই তাহার ভবিষ্যতের দিনগুলা দুঃখদৈন্যের সহিত এই রূপ অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এই দরিদ্র স্বামীকে লইয়া শৈল কি সুখ পাইবে! আবাল্য দুঃখ সেবিতা ঐ স্বর্ণলতা কি চিরকাল দারিদ্র্যের কঠোর কবলে আপনার সৌভাগ্যকে হারাইয়া থাকিবে। ঐ চারু দেহলতায় কি

রাজরাজ্যেশ্বরীর অপূর্ব্ব মহিমা কখন উদ্ভাসিত হইবে না, ঐ সুন্দর বদন খানি কি সৌভাগ্য লক্ষ্মীর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে কখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবেনা। অনেক চিন্তার পর ললিত ইহাই স্থির করিল যে, আপনার সুখের জন্য শৈলের ভবিষ্যৎ সুখকে কোন মতেই নষ্ট করা যাইতে পারে না। তখন শৈলেন্দ্রের কথা তাহার মনে পড়িল—সে এখনও অবিবাহিত। রূপ, গুন, কুল সকল বিষয়েই শৈলেন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তাহার সহিত কি শৈলের বিবাহ হয় না? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি।

পর দিন ললিত শৈলকে অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিয়া মাসীকে গোপনে একটা কথা বলিয়া রামনগর পরিত্যাগ করিল। শৈলেনদের বাটী যাইয়া এই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার পিতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল। পাত্রী পছন্দ হইলে বিবাহ স্থির করিবেন বলায় ললিত তাহাকে সঙ্গে করিয়া পাত্রী দেখাইতে আনিবার জন্য সেই স্থানে দুই দিন রহিয়া গেল।

ললিত রামনগর ত্যাগ করিবার পরেই হুগলি জেলার মাধবপুরের মিত্র জমিদারদের বাটি শৈলের বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে এইরূপ একটা জনবর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাহারই ফলে দুই দিনের মধ্যে শৈলেন্দ্রের পিতার নামে এক লেখকের নামহীন পত্র যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে শৈল অতি কুলক্ষণসম্পন্না হাঘরের মেয়ে এবং তাহাদের বংশ দোষ আছে ইত্যাদি নানাবিধ কুৎসা ও কলঙ্কের কথা লিখিত ছিল। পত্র শেষে "আপনার জনৈক হিতৈষী বন্ধু" এইরূপ

স্বাক্ষরিত ছিল। এই হিতৈষী বন্ধু যে কে ইহা জানিতে ললি-তের বিলম্ব হইল না। শৈলেন্দ্র পূর্ব্বে হইতেই সমস্ত অবগত ছিল সুতরাং সে একথা বিশ্বাস করিল না, তাহার পিতাও বিশ্বাস করিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন,—মিথ্যাকথা বলিতেই লোকে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কিন্তু এই পত্রে শৈলেনের মা কিছু বিচলিত হইলেন, শৈল হাঘোরের মেয়ে এই কথায় তাঁহার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল; কিন্তু ললিত যখন শৈলকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন যত কিছু বাধা বিপত্তি স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

শৈলদের অশৌচ শেষ হইলে গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যে বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী শুভ দিনে বিবাহ ধার্য্য হইল। ললিত বিবাহের দিন রাত্রে গ্রামবাসী ভদ্রমণ্ডলীকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু ভদ্র মহোদয় গণ সে শুষ্ক নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া রায়েদের বাটীর বাই নাচ ও মদ্যের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিশিকান্ত যখন জানিতে পারিল তাহার নামহীন পত্রে কোন ফল হয় নাই—মাধবপুরের জমিদারেরা মহা সমারোহে বিবাহ দিতে আসিবে, তখন তাহার দুর্দ্দমনীয় ঈর্ষার কতক পরিমাণে শান্তি করিতে বিবাহ দিনে সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হইতে ভাল বাইজি আনাইয়া নৃত্যগীত ও মদ্যপানের ব্যবস্থা করিলেন। মাধব পুরের মিত্রদের অপেক্ষা যে রামনগরের রায়েরা কোন অংশে

ন্যূন নহে ইহা যেন বরযাত্রী সম্প্রদায় দেখিয়া যাইতে পারে। শ্যামদাস রায়ের মৃত্যুর পর রায়েদের বাটী এইরূপ প্রায়ই বাইজী ও মদ্য মহোৎসব হইত।

শৈলের মাসী ভাবিলেন শৈলের বিবাহ যদি মাধবপুরের জমীদারের পুত্র রূপবান গুণবান বিদ্যাবান শৈলেন্দ্রের সহিত হয়—তবে তাহা অপেক্ষা আর সুখের কি হইতে পারে? ললিতের চেষ্টায় অনাথা শৈলের এই সৌভাগ্য এই কথা মনে করিয়া মাসী মনে মনে ললিতকে প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন শৈল ললিতকে আসিয়া বলিল "ললিত দাদা আমি বিয়ে করব না।"

ললিত হাসিয়া বলিল, "কেন শৈল কি হয়েছে?"

"গোপবালার বিয়ে হবার পর সে আর বাড়ী আস্‌তে পায় নাই।"

"এই কথা! তুমি বাড়ী আস্‌তে পেলেইত হ'ল।"

"তোমাকে আর মাসী মাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু।"

"মাসীমা বুড়ো—তিনি আর যেতে পারবেন না—তবে আমি নিশ্চয় যাব!"

"আচ্ছা, তুমি গেলেই হবে।" বলিয়া শৈল চলিয়া গেল। বালিকা বিবাহ কি বুঝিত না। সে মনে করিল তাহার ললিত দাদা তাহার জন্য যাহা করিতেছে তাহাতে তাহার ভাবিবার কি আছে! সে অনভিজ্ঞা বালিকা জানিত না যে বিবাহের অন্য অর্থ বন্ধন। শীঘ্রই বিবাহ হইয়া গেল। ললিত মনে

করিল, শৈলের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সে একটা নিঃস্বার্থতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে! কিন্তু সেও তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল না, দেখিতে পাইল না যে যাহার সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহার ভাগ্যে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকেই বরণ করিয়া দিল। সে যে শুধু আপনার ক্ষতি করিল তাহা নহে, আর একখানি হৃদয়ে এমন একটা ক্ষতির সম্পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল যে তাহা আর সংশোধনের কোন আশা রহিল না—উপায় রহিল না।

সপ্তাহকাল পরেই শৈল তাহার ললিত দাদার সহিত বাটী ফিরিয়া অসিল। বাটীতে আসিয়াই অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া খেলাঘর পাতিল,—কোমর বাঁধিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েক দিন থাকিয়া ললিত কলিকাতা চলিয়া গেল এবং পড়া শুনায় মনোনিবেশ করিল। অবসরের সময়ে সে তাহার সৎসাহস স্বার্থত্যাগ এবং শৈলের ভাল বাসার প্রতিদানের কথা যখনই ভাবিত, তখনই উদ্দাম আনন্দে তাহার বক্ষঃস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিত; কিন্তু তাহার হৃদয় মধ্যে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব শূন্যতার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ক্রমে একটু একটু করিয়া প্রসার লাভ করিতেছে তখন সে প্রবল আনন্দের অভি-ভূতিতে সে কথা মোটেই গোচরে আনিতে পারে নাই।

বী এ পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। দুই বন্ধুতে রাত্রি দিন পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। পরীক্ষায় আর সপ্তাহকাল মাত্র অবশিষ্ট। একদিন প্রাতঃকালে ললিত

বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, শৈলেনের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, গাত্রের উত্তাপ অতিশয়। তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া গাত্রের উত্তাপ দেখিলেন। শৈলেন বলিল, তাহার দেহে অতিশয় বেদনা হইয়াছে। সেই সময় কলিকাতায় বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ডাক্তার শৈলেনের দেহে বসন্ত প্রকাশের আশঙ্কা জানাইলেন। সুতরাং দুই তিন দিন না দেখিয়া কোনরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। রাত্রে জ্বর কিছু কমিল, পরদিন প্রাতঃকালে শৈলেন চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাইবার ব্যবস্থা করিল। প্রথমে ললিত সে প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু শৈলেনের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আর বাধা দিল না, আপনি যাইয়া তাহাদিগকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। এতদিনে শৈলেনের আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, বাসার চাকরও ফিরিয়া আসিল না। সে একবার মনে করিল শৈলেনদের বাটী যাইয়া তাহার সংবাদ লয়। কিন্তু তখনই কেমন একটা আশঙ্কা তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল, যদি কিছু অশুভ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহার পিতামাতার নিকট এমুখ দেখাইবে, এ অশুভের বুঝি সেই অপরাধী! এপর্য্যন্ত যে বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই বৃক্ষইত বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়াছে! ললিত তখন বড় সঙ্কটে পড়িল, কিন্তু সে সঙ্কট আর এক গুরুতর সঙ্কটের দ্বারা অপসৃত হইল, ললিত যেদিন শৈলেনের সংবাদ লইতে তাহাদের বাটী যাইবে

স্থির করিল, সেই দিন রামনগর হইতে সংবাদ আসিল, শৈলের জ্বর বিকার হইয়াছে শৈল মরিতে বসিয়াছে।

ললিত বাটী যাইয়া দেখিল, অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। স্পন্দ-হীন জ্ঞানহীন শৈল শয্যায় মিশিয়া আছে, কেবল নিশ্বাস বহিতেছে মাত্র তাহাও অতিক্ষীণ অতি অস্পষ্ট। সে আলু-লায়িত কৃষ্ণ কুন্তল রাশি অযত্নে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, নীলোৎপল সদৃশ স্নিগ্ধ আয়ত নয়ন দুইটি কোটর প্রবিষ্ট হইয়াছে, বদন মণ্ডলের উজ্জ্বল গৌর কান্তি মরণের ছায়ায় কালিমালিপ্ত হইয়াছে, পূর্ণ বিকারে শৈলের জীবন ডুবিয়া রহিয়াছে, ললিত প্রাণ দিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লগিল। হতভাগিনী মরিল না, মরিলে সে বাঁচিয়া যাইত। সমাজের কঠোর শাসনে সারাজীবন দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে একটু একটু করিয়া মরিতে সে যাত্রা সে রক্ষা পাইয়া গেল। তবে মরিল তাহার সুখ, তাহার সৌভাগ্য, তাহার স্বামী শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। কয়েকদিন পরে সংবাদ আসিল বসন্ত রোগে শৈলেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ললিত কাঁদিয়া আত্মহারা হইল।

শৈলেনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সেই রুগ্ন অবস্থাতেই শৈলকে স্নান করাইয়া দেওয়া হইল। ললিত আপত্তি করিল, কিন্তু মাসীমা সে সব কথা শুনিলেন না। হিন্দু বিধবার শুচি ও পবিত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? বিধবা হইবার পূর্বে শৈল মরিল না কেন! সে মৃত্যু যে তাহার বড় গৌরবের হইত! মাসীমার এ আশীর্বাদ বোধ হয় ফলপ্রদায়ক হইল।

সেইদিন হইতে বিকার আবার নূতন ভাবে আক্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও বাড়িল। ডাক্তার বলিল—"আমার দ্বারা আর এ রোগীর চিকিৎসা হইবে না।"

ললিত তখন শৈলকে দেখাইবার জন্য কলিকাতা লইয়া চলিল সঙ্গে মাসীমাও চলিলেন। অর্থব্যয়ে কুণ্ঠাশূন্য হইয়া হৃদয়ের রক্ত জল করিয়া, মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ললিত শৈলকে বাঁচাইল। অনেক দিনের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় শৈল নিরাময় হইল বটে কিন্তু সুস্থ হইতে পারিল না; তাহার দেহ লাবণ্য হীন হইয়া গেল—ম্লান দৃষ্টি অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। কেহ তাহার নিকট আসিলে সে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন সে তাহাকে কোথায় দেখিয়াছে অথচ চিনিতে পারিতেছে না। ডাক্তারেরা বলিলেন, রোগে তাহার স্মৃতিশক্তি অনেকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছে, ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই সবল ও সুস্থকায় হইলে আবার ঐ লুপ্তস্মৃতি ফিরিয়া আসিতে পারে। এক্ষণে রোগীকে বায়ুপরিবর্ত্তন করান আবশ্যক, তাহা হইলে মন ও স্মৃতি উভয়ই শীঘ্র শীঘ্র স্ফুর্ত্তি লাভ করিবে।

ললিতের এতদিনের বৃত্তির টাকা হইতেই শৈলের চিকিৎসাদি হইতেছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাতেই শৈলকে পশ্চিম লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহার মনে হইল শিরোমণি মহাশয় কাশীতে আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দেশস্থ এক আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া তাঁহার ঠিকানা আনিল। শীঘ্রই শৈলকে লইয়া ললিত কাশী রওনা

হইল। মাসী বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

মাসী দেশে আসিবার কয়েক দিন পরে নিশিকান্ত মধুপুর হইতে বাটী আসিল। সে আসিয়া যখন শুনিল ললিত রুগ্ন শৈলকে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তেনের জন্য কাশীতে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট গিয়াছে, তখন সে তাহার পাপ ঈর্ষা প্রশমিত করিতে অতি ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিল। একদিন মাসীকে নিভৃতে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল, ললিত মন্দ অভিপ্রায়েই শৈলকে লইয়া দূর দেশে গিয়াছে মাসীকে সঙ্গে লয় নাই। শৈলও নিতান্ত বালিকা নহে, ইহাতে তাহার ও সম্পূর্ণ অভিমত আছে। তাহার পর নিশিকান্ত এক গল্প করিল—মধুপুরে একটা বাঙ্গলায় শৈল ও ললিতকে সে গোপনে স্বচেক্ষে আমোদ আহ্লাদ করিতে দেখিয়াছে। কলিকাতা বা রামনগরে আসিলে আমোদে বাধ পড়িবে বলিয়া বায়ু পরি-বর্ত্তনের ছলনায় দূর দেশে সরিয়া গিয়াছে। তাহার পর এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে মাসীকে একজন হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিল।

মাসী প্রথমে একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু যখন নিশিকান্ত বলিল, ললিত ও শৈল কাশী না গিয়া মধুপুরে বাঙ্গলা ভাড়া করিয়া আছে, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তখন কথাটা একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেই দিনেই তিনি কাশীতে ললিতকে পত্র লিখিলেন। সে পত্রলিখন ব্যাপারেও নিশিকান্তের হস্তক্ষেপ ছিল, তাহার উপর ডাকহরকরাকে পুরস্কারের প্রলো ভন এবং শাসনের ভয় দেখান হইয়াছিল, এই সমস্ত কারণে

সে পত্রের উত্তরত দূরের কথা·ললিত ও শৈলের পৌছান সংবাদ ও আসিল না। তখন মাসীর স্থির বিশ্বাস হইল, নিশিকান্তের কথাই সত্য !—ললিত অধঃপতিত হইয়াছে,—শৈল রসাতলে ডুবিয়াছে !

এই জনরবে চারিদিকে বড়একটা গোল পড়িয়া গেল ! সুশ্রীরা বলিলেন, হতভাগিনী শৈল আপনার কপাল আপনি পোড়াইয়াছে, তাহাতেই তেমন সোণার চাঁদ স্বামী মরিয়া গেল ; যুবকেরা বলিলেন, বিদ্যায় চরিত্র গঠিত হয় না সংযম আবশ্যক ; প্রাচীনেরা বলিলেন, ললিতের পাশ্চত্য শিক্ষার বিষময় ফল এতদিনে ফলিল ! নিশিকান্তের চেষ্টায় শৈলের শ্বশুরালয়ে এসংবাদ পৌছিতে বড় বিলম্ব হইল না।

বী এ পরীক্ষার ফল-প্রকাশে জানা গেল ললিত English ও Philosophy তে অনার কোর্শে পাশ হইয়াছে, কিন্তু সে সংবাদ কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিল না। সহসা এক দিন ললিত ও শৈল মাসী মার দ্বারে আসিয়া দেখা দিল। শৈল আবার পূর্ব্বের শৈল হইয়াছে—তাহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিয়াছে ! অজানিত দুর্ভাগ্য তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্যকে কিছু-মাত্র ম্লান করিতে পারে নাই, বরং প্রায়াগত যৌবনের উন্মেষ সূচনা তাহার তরুণ দেহ খানির কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মাসীমা তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখিলেন না, ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া কার্য্যান্তরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শৈল ডাকিয়া বলিল, "মাসীমা, আমরা এসেছি!"

মাসী গৃহমধ্যে হইতেই বলিলেন, "আবার এখানে এলে কেন, বেশত সুখে ছিলে!"

ললিত বলিল, "হাঁ মাসীমা, শিরোমণি মহাশয় খুব যত্নেই রাখিয়া ছিলেন; আমারও মতে আরও দিন কতক সেখানে থাকিলে শৈলের ভাল হইত, কিন্তু পরশ্ব দিন সকালে শৈল বাটী আসিবার জন্য এমনই জেদ করিয়া বসিল যে আপনাকে একখানা চিঠি লিখিবারও অবকাশ পাইলাম না।

মাসী তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ললিত, আমার বুকের উপর দাঁড়াইয়া তোমাদের সেই সুখের কথা আমাকে শুনাইতে আসিয়াছ,—এই জন্যই কি দিদি তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, সেই স্নেহের কি এই রূপই প্রতিশোধ লইতে হয়!"

শৈল বলিল "মাসী মা, তুমি কি সুখের কথা বলিতেছ, ললিত দাদাকে বকিতেছ কেন, ললিত দাদা কি করিয়াছে?"

মাসী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "হতভাগিনি, তোমার ললিত দাদাকে বকিয়াছি তোমার বুকে লাগিয়াছে, ললিত দাদা তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তোমার কপাল পোড়াইয়াছে—এখনও ছলনা, এখনও চাতুরী, ললিত দাদা তোমার————"

কথা শুনিয়া শৈল ভূমে আছাড় খাইয়া পড়িল। ললিতের মনে হইল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহাদিগকে লইয়া শূন্যে মহাবেগে ঘুরিতেছে! সে বসিয়া পড়িল। অনেক ক্ষণ পরে দেখিল, শৈল অচেতন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া আছে। তাহার মুখ হইতে

নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হইয়া পৃথিবী ভাসিয়া গিয়াছে। তখন তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি মনে আসিল। 'জল' বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টি করিল, দেখিল মাসীমা গৃহে চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অবশেষে পুষ্করিণী হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল আনিয়া শৈলের মুখে ও নাসিকায় সিঞ্চন করিতে লাগিল, তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হইল বটে কিন্তু জ্ঞান সঞ্চার হইল না। বিধাতা এ কমনীয়া কুসুমপ্রতিমাকে না জানি কি কঠিন উপাদানেই গঠিত করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সকলে মাসীর বাটীতে আসিয়া দেখিল, তথায় ললিত নাই, শৈল নাই! কেবল তাহাদের আগমনের চিহ্ন স্বরূপ গাঢ় রক্তস্রোতে ধরণী সিক্ত হইয়া রহিয়াছে!

লাঞ্ছিত অপমানিত ললিত ও শৈল দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা মস্তকে লইয়া এই পৃথিবীর অনন্ত জনসমুদ্রে কোথায় ডুবিয়া গেল কেহ তাহার সংবাদ লইল না।

*　　　*　　　*

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। রাম নগরের রায়েদের অবস্থা আর সেরূপ নাই। ভোগ বিলাসকে অপ্রতিহত রাখিতে গিয়া, জঘন্য আনন্দ ও অপরিমিত অপব্যয়কে অক্ষুন্ন রাখিতে গিয়া, বাজারে অনেক ঋণ করিতে হইয়াছে, একে একে অনেক মহল বাঁধা পড়িয়াছে। শ্যামকান্ত বিবিধ অত্যাচারে পঙ্গু হইয়া রাম নগরেই আছেন, আর নিশিকান্ত আকণ্ঠ ঋণনিমগ্ন হইয়াও এখন পর্য্যন্ত মদ্য ও বাইজির সেবা পরিত্যাগ করেন নাই।

তিনি এক্ষণে কলিকাতা আসিয়া বাস করিতেছেন। নবনিয়োজিত ম্যানেজার প্রভুকে অর্থের অভাব জানিতে দেন নাই। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ব্যাঙ্কার আইদান রায় কোম্পানীর নিকট হইতে সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বাজার অপেক্ষা নিম্ন সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া এতদিন প্রভুর বিলাসাগ্নির ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছেন। নিশিকান্তের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এইবার তাহার কলিকাতার সুবৃহৎ অট্টালিকাটি পর্য্যন্ত আইদান রায় কম্পানীর নিকট বাঁধা পড়িল। বিবাহ উৎসবে ধনকুবের কুলের রমনী দিগের সহিত আইদান রায় কম্পানীর অংশীদারের পত্নীরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর হইতেই বড় ঘরের গৃহিনীও বধুরা একে একে সমাগতা হইতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আসিলেন আইদান রায় কম্পানীর অংশীদার পত্নী। সঙ্গে যথারীতি দাস দাসী যানবাহনাদি আসিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার শিশু পুত্রকে আপানার ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন। রামনগর হইতে গোপবালা প্রভৃতি দুই চারিজন যুবতী এই বিবাহে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার সময় গোপবালা তাঁহার শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে গেল, সেই সময় অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসারিত হইল, গোপবালা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল! "ও কাকীমা এযে আমাদের শৈল!" চারিদিকে শৈল শৈল বলিয়া একটা গোল পড়িয়া গেল। ততক্ষণে গোপবালা শৈলকে লইয়া একটা নিভৃত কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

*　　　*　　　*

গোপবালা জিজ্ঞাসা করিল "তুই যে লোহা ছিলি ভাই,—সোণা হ'লি কেমন করে !"

শৈল বলিল "স্পর্শমণির গুণে !"

"স্পর্শমণিটিকে শুনতে পাইনা ?"

শিশু সেই সময় বলিল, "বাবা—বাবা।"

গোপবালা শিশুকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার নাম কি বাবা ?"

শিশু বলিল "ললিল মোহন লায়।

গোপবালা বলিল, "আমাদের ললিত দাদা ?"

শৈল বলিল "তিনিই—সেই দেবতাই বটেন ! রামায়ণে শুনিয়াছি, রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে কাষ্ঠ তরণী সুবর্ণময়ী হইয়াছিল অহল্যা পাষাণী দেবী হইয়াছিলেন ! আমিও তেমনি তোমার দাদার কৃপায়, তাঁহর পবিত্র উদার প্রেমের মাহাত্ম্যে তাঁহারই চরণাশ্রয়ে—লোহা ছিলাম সোণা হইয়াছি, প্রাণহীনা প্রতিমা ছিলাম আবার প্রাণময়ী হইয়াছি !"

দুই জন বাল্য সখি আবার অনেক দিনের পর নির্ম্মলচিত্তে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময় শিশু আপন আনন্দে মত্ত হইয়া তাহাদের চতুষ্পার্শে হাততালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইতে ছিল !

দক্ষিণে

তৃতীয় বক্ষ-পাত্রী।

জীবন-সঙ্কট।

**"OF ALL THE BLESSINGS ON EARTH
ThE BEST IS A GOOD WIFE,
AND A BAD ONE IS THE BITTEREST CURSE
OF HUMAN LIFE."**

হরি খুড়া গ্রামবাসীর সকলেরই খুড়া! যাহাদের প্রকৃত খুড়া তাহারা ত খুড়া বলিয়া ডাকিবেই, আর কতকগুলি লোক সম্বন্ধের সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া বহু অন্বেষণ ও অনেক কষ্ট কল্পনার পর হরিনাথ দেকে তাহাদের খুড়ারূপে সাধারণের নিকট জাহির করিয়াছিল। অপর কতকগুলি লোক হরিখুড়োকে সথ করিয়া খুড়ো বলিয়া ডাকিত! অবশিষ্ট লোক যাহারা তেমন সৌখীন ছিল না, তাহারা হরিখুড়োকে প্রায় সকলেই খুড়ো বলিয়া ডাকে বলিয়া তাহারাও হরিনাথের সেই খুড়ো অভিধানটিকে সার্ব্বজনীন করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে হরিখুড়ো বলিয়া ডাকিতে অভ্যাস

করিয়া লইয়াছিল! আর একটা কথা,—হরি নাথও বড় কখন ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া বোধ হইত না, অধিকন্তু সাধারণের নিকট "খুড়ো" বলিয়া পরিচিত হওয়ায় আধুনিক কালের গণ্যমান্য লোকেরা যেমন সাধারণের নিকট 'রায়বাহাদুর' বা 'রাজা বাহাদুর' নামে অভিহিত হইলে সন্তুষ্ট ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তিনিও সেইরূপ সন্তুষ্ট হইতেন; কারণ যে কেহ যখনই তাহাকে হরিখুড়ো বলিয়া ডাকিত, তখনই তিনি একমুখ হাসি লইয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেন!!

হরিখুড়োর বয়স প্রায় ৫০ শের কাছাকাছি! সংসারে আর কেহ ছিল না, কেবল মাত্র এক মুখরা স্ত্রী ভিক্ষুকের অনন্যাবলম্বন ভিক্ষা পাত্রের মত, অন্ধের অদ্বিতীয় সহায় হস্তের যষ্টীর মত, অন্ধকারে এক মাত্র উপায় ক্ষীণ প্রদীপালোকের মত,—অকুল জলধিবক্ষে ক্ষুদ্র তরণীর মত এই দুস্তর সংসার জলধির বিপুল বক্ষে তরঙ্গোদ্বেলিতা চত্বারিংশদ্বর্ষদেশীয়া কলহময়ী সহধর্ম্মিনী দুরধিগম্য সংসারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন!

হরিখুড়ো প্রাতঃকালে হস্ত মুখ প্রক্ষালন কার্য্য শেষ করিয়া বহির্বাটীর রকে আসিয়া বসিতেন তাহার পর নিবিষ্ট চিত্তে তাম্রকুট সেবনে নিযুক্ত হইতেন! কখন অল্প অল্প কখন বা জোর জোর টানে নিবিড় ধুমপুঞ্জ উর্দ্ধে কুণ্ডলীকৃত হইতে থাকিত, তিনি একাকী থাকিলে মনোযোগের সহিত তাহাই

নিরীক্ষণ করিতেন ! আবার যদি সম্মুখস্থপথগামী তাম্রকূট সেবন-প্রয়াসী দুই একজন গ্রামবাসী আসিয়া জুটিত তাহা হইলে প্রাতঃকালের ক্ষুদ্র কয়েকঘণ্টা বিবিধ গল্পগুজবে নিতান্ত নিরুদ্বেগে কাটিয়া যাইত ! সেই প্রাতঃকালীন ক্ষুদ্র বৈঠকে আলোচ্য বিষয়ের কিছু স্থিরতা ছিল না, কখন বা রাধারমনের মৃত্যুতে তাহার পুত্র কুঞ্জকিশোর কেমন ধূমধামের সহিত শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, শশাঙ্কশেখর দত্তের কন্যা উল্লাসিনীর বিবাহ উপলক্ষে গ্রামে কেমন দলাদলি বাধিয়া গিয়াছিল, রামকান্ত ভট্টাচার্য্য তাহার এক মাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ব্যয় করিয়াছিল বটে কিন্তু মিষ্টান্নে অল্প পরিমানে মিষ্টত্বের কম হইয়াছিল ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সমালোচনা হইত; কখন বা এবৎসর বর্ষা শীঘ্র শীঘ্র হওয়ায় আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে উপযুক্ত সময়ে জল হইবে কিনা আশঙ্কার কথা, সকালে সকালে জল আরম্ভ হওয়ায় আদাক্ষেতে সুবিধা জনক আদা হইবে কিনা, কচুরও অনিষ্ট হইবে, এ বৎসর যে ক্ষেতে ইক্ষুর চাষ ছিল তাহাতে মটরের চাষ করিলে ভাল হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিধ কথার প্রসঙ্গ চলিত, এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে হরিখুড়োর নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধুবর্গ এতাবৎকাল নিরাপত্তা হেতু হরিখুড়োকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের নিমিত্ত সৎপরামর্শ প্রদান করিত ; কিন্তু হরিখুড়ো সে সমস্ত সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেন "না বাবা, (যে হেতু তিনি সকলেরই খুড়ো) এমন কথাটি বলিও না, তোমার খুড়ীর মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না—তোমার খুড়ী

সতী লক্ষ্মী !” তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না ! কেন যে তিনি বিবাহ করিয়া খুড়ীর মনে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক তাহা অনেকেই ভাল রূপ বুঝিতেন। তিনি যে বিবাহ করিতে আদৌ অভিলাষী ছিলেন না এমন নহে, কারণ তিনি পূর্ব্বে কোন এক বান্ধবের অনুরোধে পিতৃ পুরুষের জল গণ্ডূষের গতি করিবার জন্য বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন ক্রমে সেই সংবাদ তাঁহার সহধর্ম্মিনীর কর্ণে পৌঁছাইয়া ছিল, তাহার ফলে তিন দিন বাটীতে আহার করিয়া তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই ! ঐ তিন দিন তাঁহাকে রাত্রিকালে বহির্বাটীতে শয়নের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল ! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখন আর হরি খুড়োও নাই এবং তাহার সেই সহধর্ম্মিনীও নাই ! সম্ভবতঃ এতদিন তাঁহাদের প্রেতাত্মারও মুক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে খুড়ীর এই গুণপ্রচারে আজ যে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত তাহা কে বলিতে পারে। কলহে চির অপরাজুখিনী—খুড়ী, তাঁহার সেই কোমল কণ্ঠের মধুর সম্ভাষণে আমাদের চৌদ্দপুরুষত উদ্ধার করিতেনই অধিকন্তু তাঁহার এক ভ্রাতার “সাম্যবাদী” নামীয় এক ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্র ছিল তাহাতে শ্রুতি-সুখ-বিধায়ক জলযোগের বিরাট আয়োজনের কোন অংশে ক্রটি হইত না।

আহার নিদ্রা গল্প গুজবে হরিখুড়োর দিনগুলি একরূপ বেশ কাটিয়া যাইত ! সংসারে তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। জমীর ধান্যে সম্বৎসরের আহার্য্য রাখিয়া

যে ধান্য ও রবি শস্য উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে জমী আবাদের খরচ প্রভৃতি বাদ দিয়া প্রত্যেক বৎসর কিছু কিছু তাঁহার হাতে জমিয়া যাইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় ভারতবর্ষময় এরূপ রেলের পরিব্যাপ্তি হয় নাই! বাঙ্গালা দেশের লোকের পক্ষে কাশী গয়া মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি দূর তীর্থ যাওয়া বহু ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার, তখন বাঙ্গালীর সহজসাধ্য প্রধান তীর্থ পুরীর জগন্নাথ! অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নৌকা করিয়া জগন্নাথ যাওয়া যাইত অবশ্য ইহাতেও যে কিছু মাত্র আশঙ্কার কথা ছিল না এমন নহে। ঝড় তুফান, সামুদ্রিক কুজ্ঝটিকা ও বোম্বেটের ভয় যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ অসংখ্য হিন্দুনরনারী এ সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া বৎসর বৎসর জগন্নাথ ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইত, যে বৎসরের কথা উল্লেখ করা হইতেছে সেই বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে মহাযোগ! রথযাত্রার অনেক পূর্ব্ব হইতেই নানা স্থানের অসংখ্য লোক পুরী অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল! হরিখুড়োর গ্রামবাসীদের মধ্যে একদল লোক পুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল অবশ্য তাহারদে মধ্যে শতকরা ৯৫ জন বয়স্কা স্ত্রীলোক! এই তীর্থ গমনোদ্যোগিনী বয়স্কা রমনীদের মধ্যে হরিখুড়োর পত্নী বাদ পড়েন নাই!

একদিন অপরাহ্ন কালে হরিখুড়ো জমী চাষের মজুর ঠিক করিয়া মহাজনী হিসাবের তাগাদা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিবাহের দানের মধ্যে তিনি একজোড়া খড়ম্ পাইয়াছিলেন,

একাল পর্য্যন্ত উহাই অতি বিশ্বস্ততার সহিত পাদুকার কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাহিরে বাহির হইতে হইলে সেই কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে দিয়াই বাহির হইতেন, আবার ঘরে আসিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া মঞ্চোপরি তুলিয়া রাখিতেন! তিনি বাহির হইতে আসিয়া পাদুকা ধৌত করিয়া তুলিয়া রাখিলেন, হস্তপদ ধৌত করিবার জন্য জল পাত্র হস্তে লইলেন, দেখিলেন তাহা জল পরিপূর্ণ! বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং হস্তপদ ধৌত করিতে আর পুষ্করিণীর ঘাটে যাইতে হইল না দেখিয়া ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন! জল পাত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন পার্শ্বে জল-চৌকি তাহার উপর গাত্র মার্জ্জনী! তিনি কিছু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন একি ব্যাপার!! আমার হস্ত পদাদি প্রক্ষালনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা কে করিয়া রাখিল! এসমস্ত ব্যবস্থা যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহারই জন্য করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! তিনি মনে করিলেন এরূপ বিবেচনা করা তাঁহারই ভুল! ঘড়ায় জল বেশী হইয়া ছিল বলিয়া তাঁহার স্ত্রী ঐ জল পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়াছেন এ চৌকি খানি হয়ত তিনি আপনার কোন ব্যবহারের জন্য বাহির করিয়া রাখিয়াছেন 'গামছা' খানি হয়ত আপনি গা' ধুইতে যাইবার সময় লইয়া যাইবেন বলিয়া এস্থানে এরূপ ভাবে রাখিয়া দিয়াছেন! যাহা-হউক চৌকির উপর বসিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না, তবে জল পাত্রের জলটুকু অতিশয় কুণ্ঠার

সহিত ব্যয় করিতে লাগিলেন!

শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনি-খুড়ী গৃহের মধ্যে বসিয়া কি করিতে-ছিলেন, তিনি হরিখুড়োকে মাটীর উপর বসিয়া পা ধুইতে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "চৌকির উপর বসে পা ধোও না আমি যে পা ধোবার জন্য জল গামছা সব রেখে এলেম!" তাই নাকি? হরিখুড়ো মনে মনে বলিলেন সত্য নাকি? এত যত্ন! স্বামী কি পত্নির এত যত্নের অধিকারী! প্রথমে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া ছিলেন, প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন "না, এই রকমেই পা' ধুই, চৌকিটা কিছু উঁচা!" কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে জলচৌকির উচ্চতা অষ্ট অঙ্গুলির অধিক নহে!

হস্তপদাদি প্রক্ষালনের পর তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী বিবিধ পাত্রে আহার্য্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন, খুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাবে-আবার,—এইত বাহির হ'তে এলে!"

"সদরে গিয়ে বসিগে, লোক জন আস্‌বে!"

"জল খাবার তৈয়ারি করেছি একটু জল খেয়ে যাও!" হরিখুড়োকে প্রকৃতই অধিকতর বিস্মিত করিয়া তুলিল! এত অপ্রত্যাশিত স্নেহের কথা তাঁহার উপর স্তূপীকৃত হইয়া পতিত হইতেছে, ইহার অর্থ কি? যে স্ত্রীর মুখে এত কাল পর্য্যন্ত কখন একটা স্নেহের কথা শুনেন নাই আজ তাঁহার সেই স্ত্রী তাঁহার পা ধুইবার জন্য জল, গামছা, চৌকি ঠিক করিয়া

রাখিয়াছিলেন, তাঁহার জল পানের নিমিত্ত এরূপ বিরাট আয়োজন করিয়াছেন! এ সমস্ত সৌভাগ্য কি ভগবানের আশীর্ব্বাদ রূপে তাঁহার উপর বর্ষিত হইতেছে! হে ঈশ্বর তোমারই জয় হউক!

হরিখুড়ো বলিলেন, "না জল খাবার খাব না, বিকালে জল খেলে অম্বল হয়!"

প্রকৃত পক্ষে অপরাহ্নিক জল সেবনে তাঁহার অম্বল হয় কিনা জানিনা, কিন্তু এতাবৎকাল হরিখুড়োর এরূপ অম্বল হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই! কারণ তিনি একে একে অতীত বহুদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখিলেন; নববিবাহিত হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর সময় একবার তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন সেই সময়ে দুই তিন দিন অপরাহ্ন কালের জল যোগের ঘটা বুঝি ঠিক এইরূপই হইয়াছিল! তাহার পর—তাহার পর—না! জল যোগের এই বিরাট উদ্যোগ পর্ব্ব তাঁহার জীবনে আর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই! যাহা হউক অর্দ্ধাঙ্গিনীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি জল খাইতে বসিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের উত্তপ্ত অপরাহ্নে শীতল জলযোগ ব্যাপার বেশ সুন্দর রূপেই সুসম্পন্ন হইল! তিনি বেলের সরবৎ মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, —সেই এক দিন, আর এই এক দিন! বহুদিন হইল শ্বশুরালয়ে নূতন জামাতা রূপে কয়েক দিন যে স্নেহ ও যত্ন লাভ করিয়াছিলেন আজ আবার বহুদিন পরে আপনার গৃহে স্ত্রীর নিকট সেই স্নেহ! সেই যত্ন!! জীবনে একদিন সুপ্রভাত হইয়াছিল

আবার বহুদিন পরে এই এক দিন সুপ্রভাত হইয়াছে!

জল যোগ সমাধা হইলে বহির্বাটীতে এক ছিলাম তামাক সাজিয়া লইয়া বসিলেন! পুষ্প কিশলয় মুকুলিত নবীন লতা যেমন সমস্ত দিবসের প্রখর রবি করোত্তপ্ত হইয়া নত মস্তকে একান্ত নির্জীব হইয়া পড়ে, কিন্তু আবার শীতল সান্ধ্য বায়ু সেবিতা হইলে তাহার নির্জীব দেহে জীবনী শক্তির পুনঃ সঞ্চার হয়, নত মস্তক আবার পুনরুত্থিত হয়,—মলিন পুষ্প-পত্রে আবার চাকচিক্য ও পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে—হরিখুড়োর মনের অবস্থা আজ ঠিক সেইরূপ! একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখ একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ তাঁহার হৃদয় মাতাইয়া তুলিতেছে! অতীতস্মৃতির কঠোর আহ্বানে আজ একটু একটু করিয়া বহুদিনের একটা সুখের কথা তাঁহার হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে!

হরিখুড়ো এত দিনে সে সব কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন! এই সুদীর্ঘ জীবন যাত্রায় তিনি যে কয়েকটা দিন আলোকে পথ চলিয়া ছিলেন এখন এ সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে উর্দ্ধে, নিম্নে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যদিয়া পথ চলিতে চলিতে আপনার এ ব্যতিব্যস্ত প্রাণকে লইয়া সে কথা—সে সুখের কথা—মোটেই মনে পড়ে না! কিন্তু আজ কি জানি পূর্ব্বজন্মের কোন পুণ্যবলে আবার বুঝি সৌভাগ্যের সূচনা হইয়াছে! একটা কর্ম্মপীড়িত প্রাণ সংসারসংগ্রামে আপনার জীবনী শক্তিকে ব্যয়িত করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী

আপনার শান্তিশীতল অঞ্চলে আশ্রয় দিয়া অভয়পূর্ণ বর দানে ব্যয়িত শক্তিকে পুনঃসঞ্চারিত করিয়া আপনাদের পূজোপচার সংগ্রহের জন্য সংগ্রামে পুনঃপ্রেরণ করিবেন, এ কার্য্য কি তাঁহাদের পক্ষে একান্তই কষ্টসাধ্য!

আজ হরিখুড়াকে দেখিলেই বেশ প্রফুল্ল বোধ হয়! মুখখানি হাসি হাসি, নয়নে আনন্দের জ্যোতিঃ! এক ছিলিম তাম্রকূট ভস্মাবশেষ হইলে দ্বিতীয় বার প্রস্তুত করিলেন। সম্মুখস্থ পথ দিয়া একজন লোক যাইতেছিল হরিখুড়া তাহাকে ডাকিলেন, "কিহে রাধু, এদিকে এস, তামাক খেয়ে যাও!" রাধারমণ সদরে আসিয়া বসিল। রাধারমণ জাতিতে বৈষ্ণব। তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ কাঠের মালা প্রস্তুত করিয়া চুড়ি খেলনা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এবং অল্প পরিমাণ জমি ভাগে করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু রাধারমণ বেশ বুদ্ধিমান চতুর লোক, সে এসকল কাজে সুবিধা নাই দেখিয়া শূন্যমূলধনে 'সেথোগিরি' ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে! বৎসর বৎসর নানা গ্রামের লোককে জগন্নাথ, নবদ্বীপ, প্রভৃতি তীর্থস্থানে লইয়া যায় তাহাতে তাহার যথেষ্ট দু' পয়সা আয় হয়,—সে আয়ে সম্বৎসর সংসার বেশ চলিয়া যায়, এবং কিছু সঞ্চিত পর্য্যন্ত হয়! পাঁচ ছয় বৎসর এইরূপ 'সেথোগিরি' করিয়া বসৎবাটীটি লাখেরাজ করিয়া লইয়াছে, এবং চার পাঁচ বিঘা জমিও আবাদ করিয়াছে! রাধারমণ বসিলে পর হরিখুড়ো জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে রাধু এবার জগন্নাথ

অপর গৃহস্থের নিকট ধার করিয়া আনিয়া তাঁহার নিয়ম রক্ষা বা বায় রক্ষা করিতেন! এসকল বিষয় যে হরিখুড়ো কিছুই জানিতেন না এমন নহে; সেই জন্য তাঁহার পত্নীর আজ এই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আহার করিতে করিতে প্রেমময়ীর স্নেহ ও ভালবাসার গুরুত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন!

মাতঙ্গিনী এতক্ষণ তাঁহার নিকট বসিয়া ছিলেন,—আহার প্রায় শেষ হইল দেখিয়া তিনি হরিখুড়োকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা আজ বৈষ্ণবদের রাধু বল্‌ছিল, তুমি জগন্নাথ যাবে সত্য নাকি?"

হরিখুড়ো বলিলেন, "না আমি জগন্নাথ যাব এমন কথা তাহাকে বলিনাই!"

খুড়ী বলিলেন, "কেন জগন্নাথ চলনা, তুমি আমি দু' জনেই যাই, বয়সত হয়েছে—ছেলে পিলে কিছু হ'লনা—চলনা দিন কতক তীর্থ ধর্ম্ম করে বেড়াই—এবারে নাকি জগন্নাথে বড় একটা যোগ আছে!"

"আমার যাওয়া হবেনা, চাষবাস রয়েছে, জমি জারাত আছে তা' হলে এ সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হয়! আর তুমি স্ত্রীলোক! একা তুমি কেমন করে যেতে পার। বিপদ আছে আপদ আছে! আর জগন্নাথত বড় নিকটে নয়—যেতে আসতে দেড় মাসের পথ! তোমার যাওয়া কেমন করে হতে পারে!"

"কেন, আমার যাওয়া হতে পারে না কেন? ঐত ও পাড়ার মিত্রিদের গিন্নি যাবে, মুখুজ্যেদের পিসি যাবে, মোড়লদের বড় বউ যাবে, কামারদের মোহিনী যাবে, দত্তদের ক্ষেমা যাবে

—এরা সব যাবে কেমন করে? রাধু বল্লে কত দেশ হতে কত মেয়ে মানুষ যায়—মেয়ে যাত্রীই বেশী—তবে আমি যেতে পারব না কেন?”

তখন হরিখুড়ো নানা কারণ দর্শাইলেন! মিত্রিদের গৃহিনীর ত্রিকাল গত হইয়া শেষ দশা আসিয়াছে, মুখোপাধ্যায় বংশীয়া পিসি মৃত্যুরাজ্যের প্রবেশদ্বারে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছে, দত্তদের ক্ষেমঙ্করী ও কামারদের মোহিনী বিধবা, ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যতীত হিন্দুবিধবার অন্য কি কর্ত্তব্য আছে, বিশেষতঃ তাহাদের সহিত একজন না একজন আত্মীয়া যাইতেছেন! যখন হরিখুড়োর এ সমস্ত যুক্তি তর্ক মাতঙ্গিনীর মান অভিমানকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্থান অধিকার করিয়া রহিল, যখন মহিয়সী মাতঙ্গিনী দেখিলেন, যে তৈল, সিন্দুর চর্চ্চিত হইয়াও ভুবনভীতিপ্রদা ভবঠাকুরাণী ভুলিবার নহেন, তখন তিনি আপনার অক্ষয় তূণীর হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন একটি বাণ প্রয়োগ করিলেন যাহার একাঘাতেই তীর্থযাত্রা যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া গেল! হরিখুড়োর সমস্ত যুক্তি তর্ক প্রবল বন্যামুখে ক্ষুদ্র তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া গেল! সে অমোঘ অস্ত্রটি আর কিছুই নহে মাতঙ্গিনীর সেই কৃষ্ণোজ্জ্বলস্থূলাগ্র-নাসিকাসংলগ্ন গোরথচক্রপরিধিপরিমিত ‘নথের’ ঘনান্দোলন-মিশ্রিত মৃদুগঞ্জনা!

খুড়ীরই জয় হইল। মুখুজ্যেদের পিসি যাইবে, মিত্রিদের গিন্নি যাইবে, দত্তদের দিদি যাইবে, সুতরাং তিনি আর একাকিনী কেমন করিয়া হইলেন! এরূপ আত্মীয়েরা যখন যাইতেছেন তখন তাঁহা-

যাত্রার যাত্রী কেমন ?”

রাধা “খুড়ো মহাশয়, সে কথা আর বোলবেন না এরই মধ্যে দেড়শ যাত্রী ঠিক হয়ে গেছে এখনও সম্ভবতঃ হবে এবার রথযাত্রায় বড় যোগ !”

হরি “তাইত হে আমিও মনে করেছিলুম এ বৎসর জগন্নাথ যাব কিন্তু যাওয়া হলনা !”

রাধু “কেন যাওয়া হবে না ? চলুন না, বেশত—আপনি যাবেন তাতে আবার কথা কি, বিশেষতঃ এবৎসরের মত এমন যোগ আর কোন বৎসর হয় না, হবে না !”

হরি “নাহে আমার মত লোকের যাওয়া কি কথার কথা, চাষ বাস রয়েছে, জমি জায়াত রয়েছে, আর ত দেখ্‌বার শুন্‌বার লোক নাই ; এই আশু ধান্যের চাষের সময় হয়েছে, তার পর আমন ধান্যের জমিতেও চাষ দিতে হবে, আমি গেলে কি আর এসব হবে—তা’ হলে এবৎসরের চাষ বাসের আশা ভরসা সব ছেড়ে দিতে হয়।”

এইরূপ উভয়ের মধ্যে আরও অনেক কথা বার্ত্তা হইল পরিশেষে রাধু তামাক সাজিয়া কলিকা হস্তে অগ্নি আনয়নের জন্য হরিখুড়োর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। হরি খুড়োর পত্নী গ্রামের প্রায় অনেকেরই সহিত কথা বলিতেন কারণ অনেককেই তিনি প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিয়া নগ্নাবস্থায় খেলা করিতে দেখিয়াছেন তাহার পর তিনি আবার সকলেরই পূজনীয়া খুড়ী পদাভিষিক্তা সুতরাং কাহকেও বড় একটা তাঁহার লজ্জা করিতে হইত না, রাধা

রমণ আগুন আনিতে ভিতর বাটীতে উপস্থিত হইলে খুড়ীর সহিত তীর্থযাত্রা সমন্ধে দুই একটা কথাবার্ত্তা না হইয়াছেল এমন নহে!

সে দিন রাত্রে হরিখুড়ো আহারে বসিয়া দেখিলেন, আয়োজনের ত্রুটী নাই! বিবিধ ব্যঞ্জনে পাত্র পরিপূর্ণ, অধিকন্তু তাঁহার দুগ্ধের বাটীতে আজ দুগ্ধের পরিমাণ অন্যান্য দিন হইতে দ্বিগুণ দেখা যাইতেছে! সুতরাং তিনি অনুমানে বুঝিলেন যে সহধর্ম্মিণী স্বামী-সেবায় তাঁহার অংশের দুধটুকু পর্য্যন্ত নিয়োজিত করিয়াছেন, আজ তাঁহার নিতান্তই সুপ্রভাত! তাহা না হইলে তাঁহার স্ত্রীর এই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ কখনই সম্ভবে না। হরিখুড়ো তাঁহার স্ত্রীর এই ভালবাসার গুরুত্ব আজ বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, যে দুগ্ধকে তাঁহার স্ত্রী জনসমাজে আপনার প্রাণ বলিয়া প্রকাশ করেন, যে দুগ্ধ না হইলে তাঁহার আহারে আদৌ রুচি হয় না, রাত্রিকালীন আহারের সহিত অর্দ্ধসের পরিমিত দুগ্ধ না হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, পাকাশয়ে বায়ুর প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়, মর্ত্ত্যে অমৃততুল্য এরূপ যে দুগ্ধ সেই প্রিয়তম দুগ্ধের আপন অংশ টুকু পর্য্যন্ত সমস্ত স্বামীসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন! যদি কোন দিন দৈবক্রমে গাভী নিয়মিত পরিমাণ হইতে কম দুগ্ধ প্রদান করিত, তাহা হইলে হরিখুড়োর অংশ হইতেই সেই পরিমাণ দুগ্ধ বাদ পড়িত, কিন্তু তাঁহার পত্নীর দুগ্ধের পরিমাণ সেই অর্দ্ধ সেরই থাকিত! এমন হইত, হয়ত একদিন গাভীতে দুগ্ধ প্রদান করিল না, তাহা হইলে শ্রীমতী মাতঙ্গিনী

দের সহিত যাইতে তাঁহার আর কি বাধা আছে। কিন্তু বিপন্ন মানব যখন অকুল সমুদ্রবক্ষে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে, উন্মত্ত তরঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া একবার উৎক্ষিপ্ত আবার নিমজ্জিত হইতে থাকে, তখন সে যদি সম্মুখে একখণ্ড তৃণ দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাকেই আশ্রয় রূপে অবলম্বন করিয়া কুলে উপনীত হই-বার আশা করে, সেইরূপ হরিখুড়োর সমস্ত তর্ক বিফল হওয়ায় নিরুপায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যদি যাবে তবে আমার পাক শাক করে দেবে কে ?"

মাতঙ্গিনী "সে ঠিক কি আমি না করেই যাব! দত্তদের বাড়ী বলেছি তারা স্বীকার হয়েছে, আমি যত দিন না আসি ছ'বেলা খেয়ে আস্‌বে।" তখন হরিখুড়ো স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া কথা উত্থাপন করিয়াছেন। অদ্যকার এই যে অযাচিত স্নেহ ও যত্ন আপনার কার্য্য আদায়ের জন্য, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী যে যাইবেন সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে তিনি স্থির সংকল্প হইয়াছেন, এখন তাহাকে বাধা দেওয়া বৃথা। বাধা দিলে ফল এই হইবে যে, তাঁহার বাধা আপত্তি কিছুই টিকিবে না, মধ্য হইতে এই যে সুখময় স্নেহ ও যত্নটুকু পাইতেছেন তাহাও নষ্ট হইবে। এখনও জগন্নাথ যাইতে ৬ দিন বিলম্ব আছে সুতরাং এ ৬ দিন অন্ততঃ এক রকম ভাল রূপেই কাটিবে আশা করা যায়, এ সৌভাগ্য বড় একটা সামান্য নহে ; পরিশেষে শ্রীমতী মাতঙ্গিনীর জগন্নাথ যাত্রা স্থির হইয়া গেল।

২৬শে তারিখে রাধু আপনার দলবল লইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রোভি-

মুখে রওনা হইল। হরিখুড়ো রাধুকে ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন যেন তাহার খুড়ীর কোন বিষয়ে কোনরূপ কষ্ট না হয়। রাধু তাহাকে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিল। মুখুজ্যেদের পিসি ও মিত্রিদের গিন্নি, তাহাদের সহিত মাতঙ্গিনী যাইতেছে সুতরাং কোন ভয়ের কারণ নাই, হরিখুড়োকে বিশেষরূপে আশ্বাস দিলেন। হরিখুড়ো তাঁহার স্ত্রীর সহিত খরচের জন্য নগদ পঁচিশটি টাকা দিলেন। সকলে নির্ব্বিঘ্নে জগন্নাথ যাত্রা করিল।

পূর্ব্বে যে রূপে দিনগুলি কাটিয়া যাইত এখনও হরিখুড়োর দিন গুলি ঠিক সেই রূপই কাটিতে লাগিল, বরং এখন তাঁহার কিছু বেশী স্ফুর্ত্তি দেখা যাইত। বাটীতে গৃহিনী থাকিলে তাঁহার মনে যে সর্ব্বদা একটা ভয় ভয় থাকিত এই বুঝি কখন কোন কার্য্যে ক্রুটী হয় এই বুঝি তাহাকে বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এরূপ যে একটা সাংঘাতিক ভয় তাহার মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিত এখন আর সে ভয় নাই। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত বেশ গল্প গুজব চলিতে লগিল; তৎপর স্নানাহার করিয়া একটু মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার ব্যবস্থা হইত, অপরাহ্ন কালে একবার ঘুরিয়া আসিয়া আবার সন্ধ্যা হইতে রত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত তাম্রকূট সেবন ও গল্প চলিতে থাকিত। অন্য কোন অসুবিধা বা কষ্ট নাই, কিন্তু দুইটা বিষয় বড় গুরুতর হইয়া উঠিল।

প্রথমটি;—পঁচিশ টাকা! তাঁহার স্ত্রীর জগন্নাথ যাইবার ব্যয়ের জন্য একদমে পঁচিশ টাকা দিয়া ফেলিয়াছেন। পঁ—চি—শ টাকা বড় সহজ কথা নয়, দুই বৎসরের জমী আবাদি খরচ!

যখনই তিনি অন্যমনস্ক হইতেন তখনই ঐ পঁচিশ টাকার কথা তাহার মনে পড়িয়া যাইত। সর্ব্বনাশ, এরূপ ব্যয়বাহুল্য তিনি জীবনে আর কখনও করেন নাই। এ ব্যয় পূরণ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন। হারান সিকদার এ বার চাষ করিবে বলিয়া তাঁহার নিকট ৫০ টাকা ঋণ লইবে বলিয়াছে। আর দুই পয়সা সুদে কোন মতে ঋণ দেওয়া হইবে না, চারি পয়সার এক কড়া কম নহে। ৫০ টাকায় ২৫৲ আদায় করিতে আট মাস সময় লাগিবে, পঁচিশ টাকাত ব্যয় হইয়া গিয়েছে আবার ঐ ২৫ টাকার ৻১০ পয়সা হিসাবে আট মাসের সুদ ১২॥০ টাকা অমিতব্যয়তার দণ্ডস্বরূপ দিতে হইল! সুতরাং তাঁহার প্রকারান্তরে যাইতেছে ২৫ টাকা আর ১২॥০ টাকা মোট ৩৭॥০ টাকা! কি সর্ব্বনাশ—সাড়ে—সাঁইত্রিশ—টাকা! তিনি তাঁহার এই অবিবেচনার জন্য আপনাকে মনে মনে যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতেন!

দ্বিতীয় বিষয়টি এই;—রাত্রে বাটীতে তাঁহাকে একাকী শয়ন করিতে হয়! এক সহধর্ম্মিনী ব্যতীত সংসারে তাঁহার অন্য কেহ ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বৃহৎ বাটীর মধ্যে রাত্রে একাকী শয়ন—প্রকৃতই তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু কি করা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শয়ন করিতে হইত! রাত্রিকালীন আহারাদি শেষে করিয়া শয়ন করিলে যে রাত্রি এক ঘুমে শেষ হইয়া যাইত সে রাত্রের ত কোন কথাই নাই কিন্তু প্রায়ই এ সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না,

তাঁহার এক বড় কুঅভ্যাস ছিল অন্ততঃ একবারও তাঁহাকে রাত্রে বাহিরে উঠিতে হইত! অভয়দায়িনী সহধর্ম্মিনীর সহায়ে তিনি এতকাল আপনার হৃদয় দৌর্ব্বল্য স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই! কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর উপস্থিত অবর্ত্তমানে রাত্রিকালে বাহিরে যাইবার সময় আলোকহস্তে পশ্চাদনুসরণ করিয়া কেহ তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় না, সুতরাং গভীর রাত্রে নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে একাকী বাহিরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল! তিনি রাত্রিকালীন বাহিরের কার্য্য শয়নকক্ষের এক কোণে কোন মৃৎপাত্রে সমাধা করিতেন, এবং অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের সে সমস্ত আবর্জ্জনা গোপনে পরিষ্কার করিয়া লইতেন! অবশ্য তিনি এ গুহ্য ব্যাপার সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব গোপনে রাখিয়া ছিলেন; কিন্তু কি জানি কেন, আপনার এগুরু অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত! যদি এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের সংবাদ কোন ক্রমে তাঁহার শুচিবায়ুগ্রস্তা শুদ্ধচারিণী সহধর্ম্মিনীর কর্ণে পৌঁছায় তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টগগন কত দূর অন্ধকারময় তাহা তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন—সে প্রলয়ঙ্করী পতিব্রতার নিকট এ অপরাধের ক্ষমা নাই! তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন! কিন্তু কয়জন লোক দারুণ ভবিতব্যের হস্তে রক্ষা পাইবার জন্য আপনার বর্ত্তমান সঙ্কটকে আরও গুরুতর করিতে অভিলাষ করে!

ক্রমে মাসৈক গত হইল; সহসা এক দিন রাধু তাহার

দলবল লইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সকলেই ফিরিয়া আসিল, কেবল আসিল না, একা মাতঙ্গিনী। হরিখুড়ো এ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই রাধু তাহার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল ;— "খুড়ো মহাশয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—খুড়ী আমাদের জগন্নাথ ক্ষেত্রে ওলাউঠায় মারা গেছেন!"

এ সংবাদ প্রথমটা হরিখুড়োকে একেবারে বুদ্ধিহীন করিয়া তুলিল, তিনি এখন দুঃখের ক্রন্দন কাঁদিবেন কিম্বা স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িবেন হঠাৎ তাহার কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; অবশেষে বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "বলিস্ কি রাধু—তোর খুড়ী মারা গেছে!"

রাধু "আজ্ঞা, হাঁ খুড়ো মহাশয়, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, খুড়ী আমাদের মারা গেছে!"

তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী, যিনি রন্ধন কার্য্যে পাচিকা, সংসার কর্ম্মে বিনা বেতনের দাসী ; যিনি কলহে চির অপরাজিতা গঞ্জনায় চির অপরাঙ্মুখিনী ; যিনি বাক্যে অতি মুখরা, সর্ব্ববিধ কায়িক পরিশ্রমে চির অপ্রতিহতা ; যিনি শয়নে শয্যায় বিপুল-দেহ-বিস্তারিনী, ভোজনে ভীমা ; যিনি সম্বন্ধে সহধর্ম্মিনী স্ত্রী, ব্যবহারে পাঠশালার গুরুমহাশয়, তাঁহার এমন স্ত্রী নাই! হরি-খুড়োর চক্ষে জল আসিল না, কেবল মাত্র একটি দীর্ঘ শ্বাস ; কিন্তু রাধু তাঁহার ক্রন্দনের অভাব পূর্ণ করিল, দুই চক্ষু জল ধারণ করিতে পারে না, গণ্ডস্থল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। চক্ষুর জল রাধুর বড় আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত ছিল! রাধু যদি

কোন যাত্রা বা কীর্ত্তনাদি শুনিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার নিকট বসিয়া অপর ব্যক্তির কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিত! কারণ কীর্ত্তনকারী প্রথমে আসরে আসিয়া যেমনই "হরিহে তোমার দয়া কত" ইত্যাদিরূপে গীত আরম্ভ করিত, অমনি রাধু অহঃ—হঃ শব্দে আপন নয়ন দুইটিকে অশ্রু পূর্ণ করিয়া ফেলিত! ইহাতে রমণী সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সকলে তাহাকে একজন ভাবুক ও হরিভক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিল—এমন কি পুরুষ মহলের মধ্যেও অনেকে এই বাক্যের সমর্থন করিতেন!

রাধুর ক্রন্দনের বেগ প্রশমিত হইলে, হরিখুড়ো ব্যাপারটা কি হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধু বিস্তারিত সমস্ত বর্ণনা করিল,—রথযাত্রার দিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া খুড়ীর কলেরা হয়, তাহার পর ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে মৃত্যু হইয়াছে! কবিরাজ দেখান, ঔষধের ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন বিষয়েরই ক্রটী হয় নাই! তাঁহাদের এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে মুখুজ্যেদের পিসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিখুড়োকে দেখিয়া অল্পক্ষণ অস্ফুট ক্রন্দন করিলেন, তাহার পর মাতঙ্গিনীর মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা সালঙ্কারে বিবৃত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর—মিত্রিদের গিন্নী, কামারদের মোহিনী, দত্তদের ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি সকলেই একে একে আসিয়া হরিখুড়োকে এই শুভ সংবাদ (?) প্রদান করিয়া গেল, এবং বিনামূল্যের নয়ন জল

অকাতরে ব্যয় করিয়া রীতিমত মুখবন্ধ করিয়া সকলেই আপন আপন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিতে ভুলিল না!

হরিখুড়োর পত্নী মাতঙ্গিনীর মৃত্যুতে গ্রামের পশ্চিম পল্লী নিতান্ত নীরব হইয়া গেল! তাঁহার বর্ত্তমানে কলহব্যাপারে পশ্চিমপল্লী সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে সপ্তাহে দুই এক দিন বাদ পড়িতে লাগিল! দত্তদের ক্ষেমঙ্করী ও কামারদের মোহিনী যদিও এবিষয়ে তাহাদের খুড়ীর অভাব পূর্ণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তথাপি ফল সেরূপ সন্তোষজনক হইত না! কোন বাক্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে যদি বিবাদী বেশী বাড়া বাড়ি করিত, তাহা হইলে স্বর্গগতা খুড়ী তাহার প্রতি এমন তীক্ষ্ণধার অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন নূতন বাণ বর্ষণ করিতেন যে বিবাদী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত। সকল স্থলেই জয়শ্রী খুড়ীর পক্ষ অবলম্বন করিত! কিন্তু ক্ষেমঙ্করী ও মোহিনী তাদৃশী নিপুণা হন নাই; তাঁহারা যুদ্ধে যে সমস্ত বাণ ব্যবহার করিতেন সে সমস্ত বাণ বাক্যযুদ্ধ প্রচলনের অতি আদি যুগ হইতেই সকল কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে বাণ গুলি তত তীক্ষ্ণধার নয় এবং তাহার ক্ষতও তত মর্ম্মান্তিক নহে! কিন্তু যেমন ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য সহায়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহা-মহা-রথি-রক্ষিত অজেয় কুরু কুলকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রূঢ়বাদিনী ক্ষেমঙ্করী শ্রীমত্যা মোহিনীর সহায়ে সে গ্রামত তুচ্ছ কথা,—এই বিস্তৃত বঙ্গদেশের কলহ

সমিতির খ্যাতনাম্নী সদস্যাগণকে প্রকৃষ্ট রূপে পরাজিত করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই!

মাতঙ্গিনীর অভাবে হরিখুড়োর কিন্তু বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটিল না; আহার, শয়ন, যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু আর একটা বিষয় বড় গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি যখন প্রাতঃকালে গৃহের রকে বসিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিতেন, তখন "রাইমণি গোয়ালিনী" তাহার সেই সলজ্জ শ্যামোজ্জ্বল বদনমণ্ডলে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া নানা কার্য্যে তাঁহারই সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণ ও চতুষ্পার্শ্ব সম্মার্জ্জনীতাড়নে পরিষ্কার করিত,—গোময়ের প্রলেপে রন্ধনগৃহ তুলসী-বৃক্ষতল ও ধান্য রাখিবার গোলার নিম্নস্থ ভূখণ্ড পরিশুদ্ধ করিত, তখন তাহার বাউটিপরা সুগোল হস্তখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। তাহার পর যখন তিনি রাইমণিকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া আসিতে বলিতেন, তখন যদি একবার ভয়ে ভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে রাইমণির কলিকায় ফুৎকার দিবার জন্য সেই বায়ুস্ফীত গণ্ডস্থলের উজ্জ্বল চাকচিক্যের মধ্যে চঞ্চল নয়ন দুইটি তাঁহার ভীতিশূন্য, ভাবনাশূন্য, নিশ্চেষ্ট, অলস প্রাণের মধ্যে একটা বহুদিনের মরিচা ধরা স্মৃতিকে ঘষিয়া মাজিয়া নূতন করিয়া তুলিত! জগন্নাথ যাইবার ৫।৬ দিন পূর্ব্বে খুড়ী আবার খুড়োর মনে এক দুরাকাঙ্খা জাগাইয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাহার আকুল অভিভূতি হৃদয়ের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি মনে

করিয়াছিলেন জগন্নাথ হইতে মাতঙ্গিনী ফিরিয়া আসিলে আবার তাহাকে সেইরূপ স্নেহ যত্ন করিবে, সুতরাং তিনি এই সুদীর্ঘ দেড় মাস ধরিয়া অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন। সেই বহু দিনের কথা! নবপরিণীতা ভার্য্যার সহিত প্রথম সম্ভাষণ! তখন মাতঙ্গিনী এই রাইমণি বা ইহা অপেক্ষাও সুন্দরী ছিল। সেই এক দিন গিয়াছে, তখন জগতের সমস্ত পদার্থ হরিখুড়োর চক্ষে যেন সুন্দর বোধ হইয়াছে,—সে সুখের দিন কেমন করিয়া চলিয়া গেল? একটী একটী করিয়া অতীত বহুদিনের কথা স্মরণে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঠিক মনে পড়ে না। সুখস্বপ্নের অভিভূতিতে কেমন করিয়া সে কয়টা দিন কাটিয়া গিয়াছে,—যেমন গোপনে গোপনে আসিয়াছিল, তেমনি গোপনে গোপনে চলিয়া গিয়াছে। সেই অস্পষ্ট সুখস্বপ্নের পর এই দীর্ঘ নিবিড় দুঃস্বপ্নের মধ্যে আবার সুখের শিহরণ কেন? ইহা যে কেবল তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা ও হৃদয়ের লঘুতা তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিয়া আপনার এই দুশ্চিন্তার জন্য আত্মাকে শাস্তি প্রদান করিতে উদ্যোগী হইলেন! কিন্তু মানব প্রবৃত্তির দাস,—এই কঠোর আত্মশাসন ও নিরবিচ্ছিন্ন সংযমের মধ্যেও তাঁহার অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি একটু একটু করিয়া মাথা তুলিতে লাগিল, তখন সেই অবাধ্য প্রবৃত্তিকে কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িলেন।

মাতঙ্গিনীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হরি খুড়োর আহারাদি পূর্ব্বমত দত্তদের বাটীতেই চলিতেছে। তজ্জন্য মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে দত্তদের গিন্নী ক্ষেমঙ্করীর মাতা,—সম্পর্কে ভ্রাতৃ-

জায়াকে দিবেন স্থির করিয়াছেন। দত্তদের গিন্নী স্থির জানিতেন একজন মানুষকে দুই বেলা দুই মুঠা "হাঁড়ির ভাত" খাওয়াইতে ৫৲ টাকা কিছুতেই লাগিতে পারে না, যদি খুব বেশী ব্যয় হয় তবে তিন টাকার অধিক কিছুতেই নহে। সুতরাং মাসে মাসে ২৲ টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে। দত্ত গিন্নী হিসাব খতাইয়া দেখিয়াছেন হরি খুড়োকে এইরূপে এক বৎসর খাওয়াইতে পারিলেই তাঁহার নবদ্বীপ যাইবার সঙ্গতি হইবে। কিন্তু একজন তাঁহার এ সাধে বাদ সাধিল, তিনি আর কেহ নহেন তাঁহার দুর্জ্জয়ী কন্যা ক্ষেমঙ্করী। সংসারের রন্ধন কার্য্য ক্ষেমঙ্করীকেই করিতে হইত, সুতরাং ক্ষেমঙ্করীর ইহা ইচ্ছা নহে যে তাহাকে অধিক লোকের রন্ধন কার্য্য করিতে হয়। এমন অবস্থায় ক্ষেমঙ্করী যখন দেখিলেন যে, আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের সংসারে আহারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইয়া তাহার রন্ধনক্লেশকে বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে,—তখন তিনি আপন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই উপলক্ষে মাতা ঠাকুরাণীর সহিত তাহার একদিন বিষম বিবাদ বাধিয়া গেল। বিবাদে না পারিয়া পরিশেষে দত্তগৃহিনী আপন কন্যাকে বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং তিনি যখন ভবিষ্যতে নবদ্বীপে যাইবেন তখন ক্ষেমঙ্করীকেও লইয়া যাইবেন প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু ক্ষেমঙ্করী কিছুতেই বুঝিলেন না,—তিনি নবদ্বীপ যাইয়া পুণ্য করিবার আশায় উপস্থিত কষ্ট কিছুতেই স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি স্পষ্ট প্রকাশ করিলেন যতক্ষণ তিনি এই সমস্ত লোকের রন্ধন করিবেন সেই সময়ে অন্যের সহিত নানা বিষয়ের আলাপ

করিতে পারিবেন।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন একদিন অগত্যা দত্ত গৃহিনী হরি খুড়োকে বলিলেন, "ঠাকুর পো, তোমাকে একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে করি কিন্তু বলা হয় না। কথাটা এই আর কি,—তুমি সংসারে একা, এখন কত দিন বাঁচ্‌তে হবে তার ঠিক নাই, মানুষের শরীরত অসুখ আছে বিসুখ আছে—সময় আছে অসময় আছে, মুখে একফোঁটা জল দেবার লোক নাই—আর এই আমাদের কথাও বলি, বৌগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে পাকশালে যেতে পারে না, আমি বুড়ো হয়েছি ক্ষেমাকেই একা সব রাঁধ্‌তে বাড়তে হয়, তা কি করি বল, তুমি আপনার লোক, আহা মাতু মারা গেছে সে আমাদিকে কত মান্য ভক্তি করত, তা' তোমাকে দু' বেলা দু' মুঠা ভাত রেঁধে দিতেত আর না করতে পারি না, তা কি করি বল আমার নিজের আরত রাঁধা বাড়া করবার ক্ষমতা নাই। কথাটা বলছিলাম কি—সংসারে আপদ বিপদ আছে, রোগ বালাই আছে, তুমি একটা বিয়ে কর, অসময়ে মুখে একটু জল দিতে পারবে—সময়ে দুটো রেঁধে দিতে পারবে।"

কথাটা শুনিয়া হরিখুড়োর প্রাণের মধ্যে একটা শিহরণ ক্রীড়া করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, বুঝি ক্ষেমঙ্করীর মাতা তাঁহার হৃদয়ের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন; কিন্তু লোক লজ্জা ভয়ে প্রথমেই একেবারে পরিষ্কাররূপে সম্মতি দিতে না পারিয়া বলিলেন "কি জান দিদি এত দিন, পর্য্যন্ত কোন সন্তান সন্ততি হ'ল না, আমি মলেইত পিতৃপুরুষের নাম লোপ পাবে, সেইটাই কি আমার ইচ্ছা,

বংশ রক্ষা করা, পিতৃপুরুষের মুখে জল গণ্ডূষ দেবার গতি করা সকলেরই কর্ত্তব্য,—কিন্তু দিদি, এইত একলা মানুষ, কোথায় মেয়ে আছে কে সন্ধান করবে, সেই জন্যে বলছিলুম আর ওসব ঝঞ্ঝাটে কাজ-নাই!" ক্ষেমঙ্করীর মাতা বুঝিলেন হরিখুড়োর বিবাহ করিবার বিশেষ ইচ্ছা আছে এবং সে ইচ্ছা যে কেবল পিতৃপুরুষের নাম লোপ হইবার ভয়ে তাহা নহে। ভিতরে ভিতরে আর একটা মনের কথা হরিখুড়োর কথা দিয়া মুখ চোখের ভাব দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে তাহা তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, সে জন্য ভাবনা কি—আমরা রয়েছি—তোমার শশাঙ্ক (ক্ষেমঙ্করীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) রয়েছে, তোমার বিয়ের আর ভাবনা কি? ঐ ও পাড়ার রামরাম ঘোষের মেয়ে রয়েছে রামরাম এত দিন ধরে তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারে নাই, মেয়েও বড় হয়েছে—দেখ্‌তে শুন্‌তেও ভাল—আজই আমি এ সম্বন্ধে বলা কহা কর্‌ছি!

তখন হরিখুড়ো এক মুখ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা' দিদি তোমরা যখন রয়েছ, তখন আর আমার ভাবনা কি, তাত ঠিক! তবে দেখ! কিন্তু দিদি, যদি নিতান্তই বিবাহ কর্‌তে হয়—তবে একটু বড় দেখে মেয়ে বিবাহ করাই উচিত! তৈয়ারি ঘর সংসার পড়ে রয়েছে, এসে আপনার সব বুঝে শুঝে দেখে শুনে নিতে পারবে, দু' বেলা পাক শাক কর্‌তে পারবে—আর তা' না হলে একটি কচি মেয়ে বিয়ে করে আন্‌ব —কোথায় সে আমার সেবা শুশ্রূষা করবে, তা' না হয়ে আমাকেই আবার তার সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে কর্‌তে হয়রাণ হতে হবে!

"তাত ঠিক, সেকি আর আমি বুঝি না! রামরামের মেয়ে সুশীলা দেখ্‌তে শুন্‌তেও বেশ, কাজ কর্ম্মেও খুব চতুর, আর বয়সেও বড় আছে। সুশীলার বাপকে সে দিন জিজ্ঞাসা করে ছিলুম সুশীলার বয়স কত? রামরাম বলে সুশীলার বয়স এগার বৎসর; কিন্তু তা' কেন হবে, আমার ক্ষেমার যে বৎসর এমন হয়, (স্বামীর মৃত্যু হয়) সেই বৎসর সুশীলা হয়েছে, সে আজ ১৩ বৎসর হয়ে গেল!—তা' সুশীলা তোমার ঘরে এসে কাজ কর্ম্ম বেশ কর্‌তে পারবে!"

সে দিনের কথা এই পর্য্যন্ত। তাহার পর দিবস হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—হরিখুড়োর বিয়ে—রামরাম ঘোষের মাতৃহীনা কন্যা সুশীলার সঙ্গে। এই সুসংবাদ প্রচারের সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী মহলে একটা বড় প্রাণময়ী সমালোচনার হৈ চৈ পড়িয়া গেল! প্রথমে প্রবীণ দলের লোকেরা আসিয়া বিবাহের কথাটা সত্য কিনা হরিখুড়োর নিকট জানিয়া গেল। তাহার মধ্যে কেহ কেহ হরিখুড়োকে দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে বলিল,—কেহ বা বংশ রক্ষার জন্য তিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সৎবুদ্ধির বিস্তৃত প্রশংসা করিয়া গেল। এবং আর কতক গুলি লোক, হরিখুড়ো তামাক সাজিয়া আনিতে গেলে—তাঁহার অসাক্ষাতে—তিনি আপন ইচ্ছামত এবং আপন অর্থ ব্যয় করিয়া বিবাহ করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের উপদেশ দিবার কি অধিকার আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বক্তৃতা করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাকুর শ্রাদ্ধ করিয়া

সভা ভঙ্গ করিলেন। তৎপরে যুবক সম্প্রদায়ের সমাগম হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে এই বয়সে বিবাহ করিয়া একটি নিরপরাধিনী বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে—আপনার শেষ জীবনের অবসন্ন প্রাণে আবার একটা গুরুতর দায়িত্বকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া অনেক যুক্তি ও পরামর্শ দিলেন। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বিবাহ ব্যাপারে যাহাতে ভোগভোজের সুচারু ব্যবস্থা হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিলেন! এ বিষয়ে বক্তাদের যথেষ্ট দাবী ছিল; যেহেতু হরিখুড়োর প্রথম বিবাহ কালে তাহাদের মধ্যে অনেকের জন্ম হয় নাই। সুতরাং সে সময়ের ভোজ ব্যাপারে বাদ পড়িয়া গিয়াছিলেন! এখন তাহারা সেই দাবী বাবদে পূরা আসল মায় সুদে আদায় করিয়া লইতে চাহেন!

তাহার পর আসিলেন—রামকান্ত ভট্টাচার্য্য। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে মন্দ কথা বলিত, কারণ তাঁহার পুত্র না থাকিলেও এক কন্যার পুত্র কন্যাদি লইয়া সংসারে অনেক লোকজন ছিল! এমন কি তাঁহার কন্যার দৌহিত্রাদি হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তিনি কন্যা দৌহিত্রাদি সকলের নিষেধ স্বত্বেও বিবাহ করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার কন্যা স্বামী, পুত্রাদি, লইয়া আপন শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান! ইহাতে গ্রামবাসী সকলেই রামকান্তকে যথেষ্ট নিন্দা করিত। সেই জন্য তাঁহাকে গ্রামের লোকের নিকট অনেকটা হীন হইতে হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, হরিনাথ

সে পুনরায় বিবাহ করিবেন, তখন তিনি এই শুভ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করাইয়া আপনার দলপুষ্ট করণাভিলাষে সত্বর হরিখুড়োর বাটীতে আসিয়া দেখা দিলেন!

"ভায়া কোথায় হে,—ভায়া কোথায় হে"—এই উচ্চশব্দে বহির্ব্বাটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে, তাঁহার ভট্‌চায্‌ দাদা আসিয়াছেন বলিয়া হরিখুড়ো বুঝতে পারিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া আসন প্রদানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ভট্‌চায্‌ মহাশয় আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভায়া হে, তুমি সৎযুক্তিই স্থির করেছ, গৃহিনীর অবর্ত্তমানে গৃহীর যে কি কষ্ট সে ভুক্তভোগী না হলে লোকে জান্‌বে কেমন করে বল?—সে কষ্ট আমি বিশেষরূপ অবগত আছি! তোমার দিদি (ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী) যখন মারা গেল, তখন কত বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড আমাকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিল,—আমার জামাই, মেয়ে, দৌহিত্র, সকলেই নিষেধ করেছিল—তাদের মৎলব্‌টা কি জান ভায়া,—আমার যা কিছু আছে সব হাত কর্‌বে,—তা' না হলে—আমি নূতন স্ত্রী বিবাহ করে আন্‌লুম একমাস না যেতে যেতে তাঁরসঙ্গে আমার মেয়ের প্রত্যহ ঝগড়া হতে লাগল,—কি করি বল,—বাধ্য হয়ে সব ঝঞ্ঝাট কমিয়ে দিলুম! মেয়ে আমাকে দোষ দিতে দিতে তার স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে আপনার ঘরে গেল, গ্রামের লোক আমাকে কত কথা বল্‌তে লাগল কিন্তু আমার কষ্ট টুকুত কেহ বুঝ্‌লেনা,—এই যে মেয়ে ছিল—সে চলে গেল! আমি বিবাহ না কর্‌লে কে

দেখ্‌ত শুন্‌ত বল—তা' তুমি ও বেশ যুক্তিই করেছ,—বিবাহ করবে বই কি! সংসারশূন্য গৃহশূন্য তাতে আবার ছেলে পিলে নাই—বিবাহ করবে বই কি! এই যে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আমার একটি ছেলে হয়েছে! ঈশ্বর করেন তোমারও একটি পুত্র হোক পিতৃকুলের নাম বাজায় থাকুক, বংশটা বাজায় থাকুক, ভাল এখন বিবাহের সম্বন্ধের কতদূর কি হল বল দেখি ?"

"সম্বন্ধ এই আমাদের গ্রামেই হচ্চে, রামরাম ঘোষের বাটী!"

"বেশ বেশ রামরামের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে ভাল কথা,—মেয়েটি নামে ও সুশীলা, চরিত্রে ও সুশীলা, কাজকর্ম্মে ও বেশ পটু, বয়সে ও বড়,—ভালই হয়েছে! আমি ও এ বিষয় খুব চেষ্টা দেখ্‌ব। আর দেখ ভায়া, একটা কথা তোমাকে বলিয়া রাখি,—" তাহার পর কিছু নিম্ন কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, —"নানা রকমের লোক আছে,—লোকে লোকের মন্দ করিতে চেষ্টার বড় ক্রটী করে না,—তোমার এ বিবাহ অনেকের চক্ষুঃশূল হবে—তোমাকে নানা রকমের কথা বলে এ বিবাহ নিষেধ করবে—রামরামকে ও অনেকে ভাঙ্গচি দেবে, তুমি যেন সে সব কথা শুনে মত বদ্‌লে ফেল না। আর রাম রামকে যা' বলা কহা কর্‌তে হবে তা' আমি করব! শুভস্য শীঘ্রং বুঝ্‌লে কিনা ভায়া ?—এ শুভ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র মিটিয়ে ফলা দরকার! ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ ও পরামর্শের পর রামকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরিখুড়োর সদর বাটী পরিত্যাগ

করিলেন। ইহার দুই তিন দিন পরে হরিখুড়োর ভাবী শ্বশুর মহাশয় রামরাম ঘোষ স্বয়ং হরিখুড়োর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সাদর অভ্যর্থনা করিয়া হরিখুড়ো রামরামকে বসাইলেন। রামরাম বসিয়াই একেবারে কাজের কথা পাড়িল "খুড়ো মশায়, আমি ভট্চায্ কাকা ও শশাঙ্কশেখর দাদার মুখে শুন্লেম আপনি সুশীলাকে বিবাহ করতে চান—তা' সে বিষয় আমার মত আছে; এত দিন সুশীলার বিবাহ দিতে পারি নাই, তার ভাগ্যে আপনার ন্যায় সুপাত্র (?) রয়েছে তা অন্যত্র বিবাহ হবে কেন? এখন আপনাকে গোটা দুই কথা বল্তে এসেছি!"

রামরামের কথা শুনিয়া হরিখুড়োর বক্ষঃস্থল আহ্লাদের উদ্বেগে কাঁপিয়া উঠিল! তিনি বলিলেন, "কি কথা বল না, তুমি আমার কাছে কথা বল্বে তা' সে বিষয়ে আর এত কিন্তু কেন? আমি আর পর নই,—আর তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধও আজ কিছু নূতন নয়, কি কথা বল্বে বল?"

পাঠক, রামরামের সহিত হরিখুড়োর সম্বন্ধ নূতন নহে সত্য, কারণ তাঁহার প্রপিতামহের শ্বশুর কুলের সহিত হরিখুড়োর মাতৃকুলের পিতৃপুরুষদিগের বুঝি কি একটা সম্বন্ধ ছিল!

রামরাম বলিল, "সুশীলার বিবাহ এ বিষয়ে আপনাকে আর অলঙ্কারের কথা কি বলিব, আপনার পূর্ব্বস্ত্রার যাহা কিছু অলঙ্কার, তাহা ত সমস্ত দিবেন, আর বাউটি, চন্দ্রহার, মুড়কি মাদুলি, নারকেল ফুল, মল আর মাথার কাঁটা এই কয়খানা দিতে হইবে!"

অবশ্য এ সমস্ত অলঙ্কারই রূপার, তখন স্বর্ণের এরূপ প্রচলন ছিলনা।

হরিখুড়ো বলিলেন, "তাই ত হে এযে বড় বেশী বল্লে, যে গহনা আছে সে প্রায় ১৫০ টাকার, আবার এই যে ফর্দ্দ দিলে এ গুলিও, প্রায় ৬০। ৭০ টাকার কমে হবে না। সুতরাং ২০০।২৫০ টাকার অলঙ্কার হয়ে যাচ্ছে, তা' কি করা যায়, যখন তুমি বলছ, তখন তাতেই স্বীকার হলেম।"

রামরাম "আর খুড়ো মশায়, আপনাকে বলব না ত কার কাছে বলব, সুশীলার মা মারা গেছে আপনিই তার মা বাপ সব, আপনি না দিলে কে দেবে—সুশীলার মনে যেন কোন রকমের কষ্ট না হয়। তার বারানসী সাড়ি পরবার বেশী সাধ, এক খানা নূতন বারানসী সাড়ি দেবেন!"

হরি, "তোমার খুড়ীর একখানা বারানসী সাড়ি আছে!"

রামরাম, "আজ্ঞা, সেখানা অনেক দিনের এবং ব্যবহার করা, সুশীলাকে দেওয়া আর আপনার জিনিস আপনার ঘরে থাকা একই কথা হয়ে দাঁড়ায়েছে ত এখন!"

হরি "আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে, গোটা পঞ্চাশ টাকা এক খানা সাড়িতে পড়বে তা' কি করা যায়, দেওয়া যাবে!"

রামরাম, "আর একটা কথা খুড়ো মশায়!"

হরি "আবার কি কথা?"

রামরাম, "গোকুল বাবুর কাছে আমার ১০০শ' টাকা ধার আছে, এতদিন সে দেনা শোধ করে উঠতে পারি নাই, আপনার সঙ্গে সুশীলার বিবাহ হবে শুনে গোকুল বাবু ওৎ করে বসে আছে! যে দিন আমার বাটী আপনি বিবাহ করতে যাবেন

সেই দিন রাত্রে সে লোকজন নিয়ে সুশীলার সব অলঙ্কার পত্র কেড়ে নিয়ে আস্‌বে মতলব করেছে! সেই জন্য বল্‌ছিলাম আগে এ দেনাটা পরিশোধ কোরে না দিয়ে এ বিবাহ ব্যাপারে হাত দেবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই।”

এবার হরিখুড়ো একটু রাগিয়া বলিলেন “তুমিত নেহাৎ বোকা দেখ্‌ছি রামরাম! কার টাকা কার অলঙ্কার গোকুল বাবু জোর জবর দাস্তিতে কেড়ে নিয়ে যাবে? দেনা হলো তোমার, সে আমার অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে যাবে, এত বড় ক্ষমতা তার? কেন তার ক্ষমতা আছে—আমার ক্ষমতা নাই? সে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে পারে আর আমি পারিনা? সে মাম্‌লা মকর্দ্দমা করতে জানে আর আমি জানি না? সে বাহাদুর ব্যাটাছেলে আর আমি কি কিছু কম?

রামরাম “তা, কি বলব খুড়ো মশায়, আপনারা সে সব কথা বুঝেন ভাল, আমি কিন্তু ওত গোলমালের মধ্যে দাঙ্গা ফৌজদারীর মধ্যে যেতে ইচ্ছা করি না। বিবাহের পূর্ব্বে ঐ টাকাটা দিতে হবে, তা না হলে আমি সুশীলার বিবাহ দিতে পারব না।”

হরিখুড়ো এতক্ষণে রামরামের মনোগত ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবী অর্থনাশ জনিত আশঙ্কার মধ্যে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনুভূতির তীব্র বেদনা হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। ১০০ টাকা না হইলে রামরাম সুশীলার বিবাহ দিবে না, টাকাও বড় কম নহে, নগদ ১০০ শত! টাকা কিন্তু তখনই আবার সুশীলার সুন্দর মুখখানি মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। বালিকা বয়স হইতে সুশীলাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহার মুখখানি

সুন্দর বটে—চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল বটে, কিন্তু এত দিন সে সৌন্দর্য্য, সে ঔজ্জ্বল্য তাঁহার নয়নকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই! বিবাহের কথা উত্থাপনের পর ইতি- মধ্যে তিনি গোপনে গোপনে সুশীলাকে দুই তিন বার দেখিয়া লইয়াছেন! পূর্ব্বে তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন সে বালিকার স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য্যকে অনুভব করিবার জন্য এ অদম্য আগ্রহটুকু জন্মে নাই! এখন সেই দুর্দ্দমনীয় আগ্রহকে লইয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও দেখিবার প্রলোভনকে দমন করিতে পারেন নাই—সুশীলাকে দুই তিন বার দেখিয়া লইয়াছেন!—সে যৌবনো ন্মুখিনী বালিকাকে দেখিয়া—তাহার সেই সুচিক্কন অলকাবলুণ্ঠিত বদনমণ্ডলের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সেই আয়ত লোচনের কৃষ্ণো- জ্জ্বল তারকার স্বভাব সুন্দর অনতিরল চাঞ্চল্য দেখিয়া—সেই পরি- পূর্ণ অধরোষ্ঠের ঈষল্লোহিত ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া—আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! এত দিনে যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এখন তাহা হেমন্তের চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিশিরসিক্ত হইয়া পল্লবিত হইবার জন্য মাথা তুলিয়াছে! এতদিন বিবেক-দমিত যে বাসনাগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় হৃদয়ের এক পার্শ্বে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, এখন সেই অগ্নি আশাবায়ু সাহায্যে সমস্ত হৃদয়ক্ষেত্রে দাবদাহের পূর্ব্বসূচনা ঘটাইয়াছে! এখন সেই পল্লবিত বৃক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ফল কই? প্রজ্ব- লিত হুতাশনে অগ্নিনিবারিণী বারি কোথায়! হরি খুড়ো স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন সে ফল তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে, সে শীতল বারি লাভ শক্তির অতীত! সে ফল, সে জল একমাত্র রামরামের অধিকারে!

রামরাম যদি ইচ্ছা করে তবে সুশীলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে—যদি ইচ্ছা না করে বিবাহ হইবে না! রামরামের সন্তোষে তাঁহার সুখ—অসন্তোষে তাঁহার দুঃখ! রামরামের ইচ্ছায় তাঁহার উজ্জ্বল আগত-সন্তোষ—অনিচ্ছায় অন্ধকার ভবিষ্যৎ! এখন রামরামই তাঁহার ভাগ্যবিধিতা —! হরি খুড়োর মন চিন্তারাজ্যের আজানিত কুটিল বর্ত্মে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ফেলিল! তখন তিনি অন্যমনস্কে বলিয়া উঠিলেন 'তবে কি করা যায়?"

রামরাম উৎসাহের সহিত বলিল "এআর করা করি কি? আপনি আজ সেই টাকাটা দিয়ে ফেলুন, আমি দেনাটা রাত্রেই পরিশোধ করে ফেলি, পরশু দিন বিবাহ হয়ে যাক।"

হরি "তবে তাই হ'ক, আমি ১০০ টাকা দেব, কিন্তু এত তাড়া তাড়ি কাজ কেমন করে হতে পারে? টাকা নেবে তার লেখা পড়া আছে. সাক্ষী সাবুদ আছে, তাতে ত কিছু সময়ের আবশ্যক!"

রামরাম "লেখা পড়া কিসের,—আর সাক্ষীই বা কিসের? এ টাকা কি আমি আমার কন্যাদায়ে আপনার কাছে ঋণ নিচ্ছি, যে তার একটা লেখা পড়া আবশ্যক! একি আমার মাতৃদায় পিতৃদায় পড়েছে—যে আমাকে ঋণ করতে হবে! এ আমার মেয়ের বিয়ে—যখন আমার সুবিধা হবে তখন দেব,—তাতে আবার ঋণ করতে যাব কেন? আমার এই ১০০ টাকা, আর সুদ ৫০ টাকা—এই মোট ১৫০ টাকা দিয়ে যদি বিবাহ করতে ইচ্ছা হয়—করবেন! আমি ত আর আপনাকে সাধাসাধি করছি না—আর আমার মাতৃপিতৃ দায় ও পড়ে নাই যে ঋণ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!"

হরিখুড়ো মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন—কিন্তু বাক্যে তাহার কিছুই প্রকাশ করিলেন না! মনে মনে বলিলেন, "তোমার মাতৃপিতৃ দায় পড়বে কেন—আমারই মাতৃপিতৃদায় পড়েছে, তাই টাকা দিয়ে আমাকে বিবাহ করতে হবে; তুমি কত বড় বদমায়েস পাজী আমি একবার ভাল করে দেখে নেব, আগে বিবাহটা হয়ে যাক!"

তিনি ১৫০ শত টাকা দিতে স্বীকার পাইলেন। তৎপরে রাম রাম বলিল "দেখুন খুড়ামহাশয়, গ্রামে কত রকম লোক আছে, কে যেয়ে দিদিকে নানা রকম কথা শুনিয়েছে, আপনি বুড়ো আপনি মৌলিক, আপনার সঙ্গে সুশীলার বিবাহে কিছু সুখ হবেনা, কোন আমোদ প্রমোদ হবেনা! তিনিত মহা কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেছেন,—সুশীলার বিবাহে না আমোদ প্রমোদ হলে তিনি বিবাহ হতে দেবেন না! তা বিবাহে যাতে আমোদ আহ্লাদ হয় সেটা আপনাকে করতে হবে। বিবাহের তিন দিন গ্রামের লোকজনকে খাওয়াতে দাওয়াতে হবে, আর দুই একদল বাজনা আনতে হবে, সর্ব্বরকমে প্রায় ৭০।৮০ টাকা পড়ে যাবে, আপনি এ সকল না করলে আর কে করবে বলুন!"

হরিখুড়োকে যে রোগে ধরিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার আশা নাই! সুতরাং ইহাতেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! সেই দিনেই রামরাম ঘোষ ১৫০ শত টাকা লইয়া গেল। গোকুল বাবুর নিকট তাহার কখন কোন ঋণ ছিল কিনা সে বিষয় সন্দেহ, কারণ ইহার পরবর্ত্তী ঘটনায় ঐ টাকা লইয়া অনেক পুরাতত্ত্বের

অনুসন্ধান ও অনেক গুঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন হইয়াছিল, কিন্তু কোনই ফলদায়ক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায় নাই। তৎপর দিবস রামরাম বিবাহ উপলক্ষে গ্রামবাসীদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত এবং বাদ্যকর আনিবার জন্য হরিখুড়োর নিকট হইতে ৮০৲ লইয়া গেল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, তাহার মধ্য হইতেও রামরামকে সিকি পয়সা ব্যয় করিতে হয় নাই। কারণ, পাছে বাদ্যকোলাহলে গ্রামের দরিদ্র নীচজাতিয়েরা তাহার বাটীতে বিবাহ বুঝিতে পারিয়া তৈল, হরিদ্রা ও জল পান লইতে আইসে এই ভয়ে রামরাম বাদ্যের আয়োজন করেন নাই! আর আহার উদ্যোগের কথা সে বিষয়ে তিনি প্রথমে যথেষ্ট চেষ্টা ও উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে চেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি বিবাহের টাকা প্রথমে হাতে পাইয়াই একেবারে ১০ মন চাউল কিনিয়া ফেলেন, এবং গ্রামবাসীদিগকে আশ্বাস দিয়া বলেন, সুশীলার বিবাহের সময়ে তাহাদিগের আহারাদির ব্যবস্থার জন্য সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে! কিন্তু যখন বিবাহের প্রথম দিবস কাটিয়া গেল দ্বিতীয় দিবসের ও অপরাহ্ণ আসিল, কিন্তু একজনও গ্রামবাসী কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক কেহই রামরাম ঘোষের বাটীতে একখানি পাত পাতিল না, বা কোনরূপ নিমন্ত্রিত হইল না, তখন বিবাহ দিবসের প্রাতঃকালীন শিবতলার বৈঠকে সকলে স্থির করিলেন যে চতুর রামরাম ঐ যে ১০ মন চাউল কিনিয়াছে—উহা বিবাহে ব্যয় করিবার জন্য নহে, সুবিধা দরে পাইয়া আপনার সাংসারিক ব্যয়ের জন্য একেবারে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে!

অদ্য রাত্রে সুশীলার সহিত হরিখুড়োর বিবাহ। বলা বাহুল্য বিবাহের সমস্ত ব্যয়ই চতুর রামরাম হরিখুড়োর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে! সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিখুড়ো রামরামের বাটীতে সাজসজ্জা করিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার একটু পরেই লগ্ন ছিল! বর সভাস্থ করা হইল, যথাবিহিত মন্ত্র পাঠ হইলে হরিখুড়োকে ভিতর বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। স্ত্রীআচার হইলে আবার সভায় আনা হইল। এতক্ষণ হরিখুড়া প্রকৃতিস্থ ছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না! তাঁহার অতৃপ্ত পিপাসা পূর্ণ হইল, সুখের স্বপ্ন সত্য হইল। চক্ষু মুদিয়া সেই প্রাণময়ী প্রেমময়ী প্রতিমাকে ভাবিতে লাগিলেন! এমন সময়ে প্রলয়কালীন গম্ভীর জলদ হুঙ্কারের ন্যায় এক বিকট হুঙ্কারধ্বনি তাঁহার অপ্রতিহত চিন্তার সুখময় স্রোতকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল!

তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দমিয়া গেল, আত্মবিহ্বল হইয়া পড়িলেন; দেখিলেন এক ভীষণা ধুমাবতী মূর্ত্তি বিরাট শতমুখী হস্তে তাঁহাকেই শাসাইয়া বলিতেছে "হতভাগা, মুখপোড়া, আটকুড়ো ডেক্‌রা! বিয়ে কর্‌তে সাধ গেছে? ছুক্‌রি বউ ঘরে আনতে সাধ গেছে? বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ! এই ঝাঁটা দেখেচ—উঠ বল্‌ছি।"

হরিখুড়ো স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিলেন ইনি তাঁহারই সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী সশরীরে সপ্রহরণা সম্মুখে বর্ত্তমানা, কিম্বা বুঝি মৃত্যুর পরেও তিনি আপন দাবী ত্যাগ করিতে

অসম্মতা, তাই এমন সময়ে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। যাহা হউক তিনি আর কথাটি না বলিয়া যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি বলে ধীরে ধীরে আসন পরিত্যাগ করিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তৎপরে নিতান্ত পোষমানা চতুষ্পদ জন্তুর মত মাতঙ্গিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন,—বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল

আক্কেলসেলামী স্বরূপ হরিখুড়োর প্রায় ২০০ শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল! মাতঙ্গিনীর প্রত্যাবর্ত্তনে সত্য ঘটনা প্রকাশ পাইল! তিনি পর দিবস প্রাতঃকালে রাধু, মুখুজ্যেদের পিসি, দত্তদের দিদি, মিত্রদের গিন্নী প্রভৃতি তাঁহার সহযাত্রীদের সে দিনের মত বেশ অম্লমধুর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, তাঁহার অসুখ হইলে পর সহযাত্রীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এবার জীবনের আর কোনরূপ আশা ছিলনা, তবে কোন ভদ্র কায়স্থ পরিবারের দয়া ও যত্নে প্রাণ পাইয়াছেন! এবার জগন্নাথ ক্ষেত্রে অনেকে ওলাওঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে—যাহাকে অসুখে ধরিয়াছে সে আর রক্ষা পায় নাই, কেবল তিনিই ঈশ্বরেচ্ছায় (এবং হরিখুড়োর এখনও গ্রহশান্তি হয় নাই বলিয়া) বাঁচিয়া গিয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি?

তৎপরে তিনি রাধু প্রভৃতি জগন্নাথ যাত্রীদিগের ব্যবহার এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক স্বামীর আচরণ প্রভৃতি সমস্ত বিশদরূপে তাঁহার 'সাম্যবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ও বঙ্গীয় সমাজ সংস্কারক সভার অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ ভ্রাতাকে অবগত করাইলেন। প্রত্যুত্তরে ভ্রাতা ভগ্নির দুঃখে একান্ত দুঃখিত হইয়া

এক বিস্তৃত পত্র পাঠাইলেন, তাহাতে নানা কথা লিখিত ছিল! সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পবিত্র সমাজ-শৃঙ্খলার মধ্যে কেমন করিয়া প্রতীচি-নীতি-বর্দ্ধিত অজ্ঞানান্ধ অসুরেরা মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছে—তাহাদের পাশবিক শক্তির কঠোর প্রতিক্রিয়া কেমন করিয়া পুণ্যময় জ্ঞানময় সত্যময় হিন্দু ধর্ম্মের সমাজ বন্ধনকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,— অন্ধচক্ষে আলোক দর্শন করিবার জন্য পবিত্র সত্যকে পশ্চাতে রাখিয়া গৌতম পরাশরের চিরোজ্জ্বল স্মৃতিকে কাল সাগরে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যোগী হইয়াছে, মনুর মীমাংসাকে মিথ্যা-কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া দেবতার ভোগ্য ফল অসুরেরা উচ্ছিষ্ট করিতেছে, পরমেশ্বরের পবিত্র করুণার দোহাই দিয়া জঘন্য পাশবিক প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে, আরও লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দশার দিনে তাহাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়ায় তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইতেছে, আপনাদের জাতীয় উন্নতিকে সুদূর পরাহত করিতেছে, ইহা তিনি নানাবিধ যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি আবার লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীর সংবাদ পত্রে অনাদর হেতু তাঁহার প্রাণের ত্রৈমাসিক 'সাম্যবাদী" এখন ষন্মাসিকে পরিণত হইয়াছে কারণ গ্রাহক সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পরিশেষে ভগ্নিকে আশ্বাস দিয়া লিখিয়াছেন, যে আগত সংখ্যায় "বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ" ও "জগন্নাথে রাহাজানী" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ, 'সাম্যবাদী' তে প্রকাশ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিবেন। ইতি ;—

আমরা উপসংহারে পাঠকদিগকে একটা সুসংবাদ দিয়া রাখি। মাতৃহীনা সুশীলার স্বামীভাগ্য ভাগ্যবিধাতা অন্যরূপ লিখিয়া ছিলেন ; সেই জন্য জরাজীর্ণ বিবাহপাগল হরিখুড়োর অর্থ, নির্দ্দয় স্বার্থপর পিতার অর্থ-প্রবুদ্ধ লোভ, রামকান্ত ভট্টাচার্য্য ক্ষেমঙ্করীর মাতা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমনা গ্রামবাসীদের স্বার্থময় সম্মিলিত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। যে ভদ্র কায়স্থপরিবারের যত্নে ও আশ্রয়ে মাতঙ্গিনী জীবন লাভ করিয়াছিলেন সেই পরিবারের এক তরুণ বয়স্ক অবিবাহিত শিক্ষিত যুবক মাতঙ্গিনীকে লইয়া তাহাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনীর আগমনে যখন বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল, হরিখুড়ো সভা হইতে উঠিয়া গেলেন, যখন রামরামের মান যায়, জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়, তখন সভাস্থ সকলের অনুরোধে সেই ধর্ম্ম-ভীরু উদার-হৃদয় যুবক সুশীলার পানিগ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে

চতুর্থবৃক্ষ—অশ্বত্থ

প্রতিজ্ঞারক্ষা।

"Kindness in women, and not their beauteous looks
Shall win my love."

এই আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা। অতি শৈশবাবস্থায় জন্মস্থান পল্লীগ্রাম হইতে বিদায় লইয়া সুশিক্ষার অনুরোধে আত্মীয় স্বজনের সহিত কলিকাতায় বাস করিতে ছিলাম। চৌদ্দ বৎসর কলিকাতা বাসের পর যখন অনন্ত জ্ঞান-সাগরের বিন্দু মাত্র জলকে কণ্ঠস্থ করিলাম, তখন আমার বন্ধু-বান্ধবগণ সংসার-মরু অতিক্রম করিবারপক্ষে মরু-প্রবাসী উষ্ট্রদিগের মেরুকুম্ভস্থিত ঘণীভূত মেদের ন্যায় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া স্থির করিলেন! আমি আর যাহাতে নিষ্কর্ম্মা বৈদ্যনাথের বলদের ন্যায় দুই বেলা অন্নধ্বংস করিয়া সংসারের ভার বৃদ্ধি না করি, পরন্তু কলুর ঘানির বলদের মত কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিয়া অন্ততঃ আপনার ব্যয়টাও চালাইতে পারি তাহারই পরামর্শ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সকাল সন্ধ্যায় চলিতে লাগিল। আমার কিন্তু এসকল ভাল লাগিত না, যে স্থানে এই সকল পরামর্শ হইত সে স্থানে আমি বড় বসিতাম না, সে দিক দিয়া আমি বড় চলিতাম না। আমার মনে হইত,—যে সমস্ত পুস্তকের সহিত বাস করিয়া আমার জীবনের এই সুদীর্ঘ চৌদ্দটা বৎসর কাটিয়া গেল,—যাহা-

দের সহিত সহবাসে আমি বড় সুখেই এতটা কাল কাটাইয়া দিলাম, সেই সকল পুস্তকের নিকট হইতে, সেই প্রাণসমপ্রিয় পুস্তকগুলির নিকট হইতে, কেমন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত বিদায় লইব ?

কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইতে মানব ইচ্ছা প্রবল নহে, ভবিতব্য হইতে অপর কিছু শ্রেষ্ঠ নহে,—সুতরাং আমার ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যই হইল না। খুড়া মহাশয় এক দিন আমাকে তাঁহাদের অফিসে যাইতে বলিলেন। তাঁহার কথা মত সেই দিন অফিসে যাইলাম। বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাতের পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল! সকল কথার সারসঙ্কলন এইরূপ;—মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সাব্ ডিভিসনের মধ্যে এক স্থানে তাঁহাদের এক Agency Business এর একটা Head office আছে, সেই অফিসে সম্প্রতি এক জন কেসিয়ারের পদ খালি হইয়াছে, সেই পদের মাসিক বেতন ৪০ টাকা। আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইল; আগত সোমবার দিন রাত্রে আমাকে সেই স্থানে রওনা হইতে হইবে। সাহেব আমাকে এক খানি নিয়োগপত্র দিয়া তাঁহার সেই শোভন দন্ত রাশি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে যাহাতে আমি ভালরূপে কাজ কর্ম্ম করি সে বিষয়ে আমাকে বিবিধ উপদেশ দান করিলেন, ভবিষ্যতে আমার উন্নতি পক্ষে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন, এ কথাও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সাহেবের এই সহৃদয়তায় আমার একটুও কৃতজ্ঞতার ভাব আসে নাই, কারণ তথন আমি ভাবিতে ছিলাম এই কলিকাতা, ছাড়িয়া

এই আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, কোথায় মৈমনসিংহ—কিশোরগঞ্জ যাইতে হইবে। যে এতদিন এক পা-ও ঘরের বাহির হয় নাই, সেই ব্যক্তি ৪০৲ মাহিনার জন্য সম্পূর্ণ অজানিত অপরিচিত বন্ধু-বান্ধব-শূন্য দূর দেশে যাইবে! কেন আমি কি সংসারের এতই ভার বৃদ্ধির কারণ হইয়াছি? রাগের মাথায় কতকটা কথা খুড়া মহাশয়কে বলিয়া ফেলিলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া ধীর স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা সুশীল, মাস কতক বিদেশে ঘুরে এস, কতক কাজ কর্ম্ম শেখা হবে, তার পর এই কল্‌কাতায় আমাদের এই অফিসেই একটা ঠিক করে দেব। তুই আমাদের কাছ ছাড়া হয়ে থাকিস সেটা কি আমোদেরই ইচ্ছা। তা ত নয়,—তবে কি জান বাবা, ৫।৬ মাস বাহিরে বাহিরে ঘুরে এলে কাজটা গোড়া হতে শেখা হ'বে, আর তখন সাহেবদিগকে মাহিনার সম্বন্ধেও একটু জোর করে ধরতে পারা যাবে। আর এই আস্‌ছে ফাল্গুন মাসে তোমার বিবাহটা দিতে হ'বে; সেই সময় যে তুমি কল্‌কাতায় আসবে—আর তোমাকে বিদেশে যেতে হবে না।"

বিবাহের কথাটা শুনিয়া আমার একটা কথা মনে পড়িল। পাঠাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া যতদিন না উপার্জ্জনক্ষম হইতেছি ততদিন বিবাহ করিব না। বিবাহের কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। বিদেশগমন আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার একটা উপায় স্বরূপ মনে করিয়া আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলাম না। সোমবার রাত্রে আমাকে কর্ম্মস্থানোদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে, রবিবার সমস্ত বন্ধুবান্ধব দিগের সহিত দেখা

সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইলাম। সোমবার সকাল বেলা হইতে বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। উদ্যোগ আয়োজনের বেশি কিছু ছিল না; কেবল মাত্র একটি ট্রাঙ্ক ও সামান্য শয্যা লইয়া একটি মোট হইয়াছিল, এ উদ্যোগের সমাপ্তি ১৫ মিনিটের মধ্যে হইয়া গেল। তাহার পর পুস্তকের আলমারি খুলিয়া খাতা গুলিকে গুছাইয়া বাঁধিলাম, পুস্তক গুলিকে ঝাড়িয়া রাখিলাম, এই বিদেশ যাত্রার দিনে তাহাদিগের নিকট হইতে বহুদিনের জন্য বিদায় লইতে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল,—নয়ন ছল্ ছল্ হইয়া আসিল; মনে করিলাম, এই দীর্ঘ প্রবাসে দুই একখানা পুস্তককে সঙ্গে লইয়া যাই, কিন্তু কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লইব? সকলেই যেন আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে "আমাকে সঙ্গে লও।" সুতরাং কাহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল না। ক্ষোভে দুঃখে আলমারি বন্ধ করিয়া চাবিটি বাটীর কূপে নিক্ষেপ করিলাম, কেহ জানিতে পারিল না।

রাত্রি ৯.৩৫ মিনিটের গাড়িতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উঠিলাম। কাকাবাবু ও আমার এক বড় ভাই ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া ছিলেন! তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া শেষ বিদায় লইলাম, তাঁহারা যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন আমি প্রতি সপ্তাহে এক খানি করিয়া পত্র লিখিতে কোন মতে বিস্মৃত না হই। আমার মুখে তখন কথা ছিল না। তাঁহাদের সকল কথাতেই ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার পাইয়া গাড়িতে উঠিয়াবসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পর দিন প্রাতঃকালে ৫টা ৫।৩০ টার সময় গাড়ি গোয়ালন্দে পেঁাছিল। পদ্মা

নদী আমি এই প্রথমে দেখিলাম। আষাঢ়ের ভরা নদী আপনার দিগন্ত বিস্তৃত বক্ষের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গসমূহকে বুঝি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চঞ্চল বায়ুর প্রতিঘাতে উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ সমূহ অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া লম্ফে লম্ফে তীরভূমি অতিক্রম করিতেছে। তীরভূমির এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অগণিত নৌকা পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদের উন্নত মাস্তুল সমূহ রণোন্মুখ সৈনিক দিগের সঙ্গীনের ন্যায় বোধ হইতেছে। সেই সুদীর্ঘ নৌকাবহর দেখিয়া বোধ হয়,—যেন স্পেন সম্রাট ফিলিপের দ্বিতীয় আর্ম্মাডা পদ্মায় উপকূলে আসিয়া লঙ্গর করিয়াছে—।

গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ উপস্থিত হইলাম, সে স্থান হইতে শীতলাখ্যা, শীতলাখ্যা হইতে মেঘনা দিয়া কাছাড় লাইনে চলিলাম। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি ১২॥ টার সময় আমি আমার অভীপ্সিত ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া এক খানা নৌকা ডাকিয়া আমাকে যে স্থানে পৌছিয়া দিতে হইবে সেই স্থানের নাম বলিলাম। মাঝি বলিল "মহাশয় নয় সিকা ভাড়া লইব, —তাহা না হইলে এত রাত্রে নৌকা বাহিতে পারিব না।" আমি তাহার এই অসম্ভব ভাড়ার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত ভাড়া চাহিতেছ কেন?"

মাঝি বলিল "মহাশয়, সে স্থান কি নিকটে! এখান হইতে চৌদ্দ মাইল! আজ রাত্রিতে কোন মতেই ত সেখানে পৌছাইতে পারিব না,—কাল বেলা ১১ টা ১২ টা হইবে।"

ও সর্ব্বনাশ! আমি যখন কলিকাতা হইতে রওনা হই, তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের অফিস্‌টা ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকটে, ২।৪ মাইল দূরে। তবে কি তাহারা সেকেন্দারী মাইলের হিসাবে বলিয়াছিল না কি? উপায়ান্তর বিহীন হইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। আমার মনে হইল যেন অদৃষ্টদেবী আমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন মহৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দানের নিমিত্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া দ্বীপান্তরিত করিতেছেন!

'আমি রওনা হইয়াছি' এই বার্ত্তা কলিকাতা সদর অফিস্‌ হইতে এখানকার অফিসে টেলিগ্রাম দ্বারা জানান হইয়াছিল। ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। ঠিক নদীতীরেই অফিস্‌। ঘাটে নৌকা লাগিল দেখিয়া একজন দ্বারবান ছুটিয়া আসিল। আমি তাহাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কুঠী ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড কম্পানীর কি না?" সে আমাকে মস্ত একটা সেলাম ঠুকিয়া বলিল "হাঁ হুজুর"! মাঝিকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, দ্বারবানকে আমার মোটটি বাসায় পৌছাইতে বলিয়া দিয়া, আমি বরাবর অফিসে গেলাম। ম্যানেজার সাহেব অফিসেই ছিলেন। পরস্পর অভিবাদনের পর সাহেব আমাকে বসিতে বলিলেন। বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সকলই কলিকাতার কথা,—কাজকর্ম্মের কথা, কতক কতক খুড়া মহাশয়ের নিকট শুনিয়া গিয়াছিলাম, আর কতক বা আপনার বুদ্ধিমত উত্তর করিলাম। পরে সাহেব আমাকে বিদায় দিয়া বলিলেন, ক্যাসের চার্জ্জ অপরাহ্ণে বুঝিয়া লইবেন।

সে স্থান হইতে উঠিয়া বাসায় আসিলাম। কোন্‌ বাসাটি

আমায় তাহা দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত একজন দ্বারবান আমার সঙ্গে আসিল। দেখিলাম, কতকটা স্থান দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটা দরমার ঘর। দ্বারবানের মুখে শুনিলাম, একটি ঘর শয়নের নিমিত্ত ও অপরটি রন্ধনের নিমিত্ত। শয়নের ঘরে একখানি চৌকি ও এক পার্শ্বে একখানি বেঞ্চ রহিয়াছে। চৌকির উপর একখানি মাদুর পাতা, তাহার উপর আমার বিছানাটি কে পাতিয়া রাখিয়াছে। আমি চৌকির উপর বসিলাম। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ৪।৫ জন লোক ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল; তাহারা এই অফিসেরই লোক। সকলের সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইল; তাহার মধ্যে একটী লোক আমার বেশ পছন্দ মত হইল। লোকটি আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়, কথাগুলি বেশ মিষ্ট, মুখখানিতে দৃঢ়চিত্ততা যেন স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে; কথাবার্ত্তা বেশ সংযত, বাড়ী কুমিল্লা জেলায়,— নাম মহেন্দ্র। সকলে চলিয়া যাইবার পরেও সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, অনেক কথা বলিল; এখানকার কাজ কর্ম্মের কথা,— ম্যানেজার সাহেবের কথা। এই সমস্ত কথা শেষ করিয়া মহেন্দ্র আমার আহারের জন্য উদ্যোগী হইল। বাসার সম্মুখেই নদী কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। ছোট বড় তরণী গুলি বায়ুস্ফীত পাইল ভরে পক্ষিণীর ন্যায় বেগে চলিয়া যাইতেছে। নদীবক্ষের আকুল উচ্ছ্বাসগুলি বায়ু-প্রতিহত হইয়া ক্রমোচ্চ তীরভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। অন্যমনস্ক হইয়া

ভাবিতে লাগিলাম, আমি আজ কোথায়! সেই সদাকোলাহল মুখরিত কলিকাতা, আর এই নির্জ্জন পল্লী! সেই চিরপরিচিত আত্মীয় স্বজনের কণ্ঠস্বর,—আর এখানে ঐ যে বৃক্ষ ডালে বসিয়া পাখী ডাকিতেছে ওটি পর্য্যন্ত যেন অপরিচিত! আমার সেই জীবনযাপনের কেন্দ্রস্থান হইতে আজ শত যোজন দূরে পড়িয়াছি!

মহেন্দ্র আমাকে স্নান করিতে বলিল। রন্ধনের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, স্নান করিয়া পাক চড়াইতে হইবে! ঐ বিদ্যাত আমার দ্বারা হইবার নয়, কেমন করিয়া পাক করিতে হয় আমিত জানি না! আমি মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহেন্দ্র, তোমাদের আহা-রের ব্যবস্থা কি রূপ ?"

মহেন্দ্র বলিল "আমরা সকলে মিলিয়া একটা লোক রাখি-য়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ তাহা না হইলে সেই স্থানেই সমস্ত বন্দো-বস্ত হইত; এখানেত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না!" আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! একদিন নহে দুইদিন নহে এই সুদীর্ঘ ছয় সাত মাস কেমন করিয়া দুইবেলা পাক করিয়া খাইব! খুড়া মহা-শয়ের উপর মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল;— তিনি কেন আমাকে এই মঘের মুল্লুকে পাঠাইলেন,—আর তাঁহারই বা ইহাতে দোষ কি, এরূপ বিপত্তি ঘটিতে পারে ইহাত আমার মনেও অনুমাত্র উদয় হয় নাই! আপনার ললাটকে ধিক্কার দিয়া স্নানে গেলাম।

নদীতে একটী দুরন্ত বালিকা কলসী লইয়া সাঁতার দিতে ছিল। আমার আগমনে সে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ব্বের

মত সাঁতার দিয়া তীরে আসিল, তীরে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আপনি কি আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম "হাঁ, আমিই আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছি!"

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা বাবু, কলিকাতা কি আমাদের এই গ্রামের অপেক্ষাও বড় ?"

আমি তখন নদীতীরে জলের ধারে দন্ত পরিষ্কার ছলে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম,—কেমন করিয়া এই নদীজলে স্নান করিব। যে ব্যক্তি চিরকাল কলের জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে,—যে ব্যক্তি আড়াই হাত দীর্ঘ, দুই হাত প্রস্থ, ও দুই হাত গভীর চৌবা-চ্চাকেই স্নান করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠজলাধার বলিয়া মনে করিত, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া এই দিগন্তপ্রসারিতা উচ্ছ্বাসময়ী স্রোতস্বিনীর বিপুল গর্ভে অবগাহন করিবে! বালিকার প্রশ্নের উত্তরে আমি অন্যমনস্কে বলিলাম, "কলিকাতা এ গ্রাম অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক বড়!"

বালিকা বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করিল "অনেক বড় ?"

বালিকার সেই বিস্ময় বিহ্বল স্বরে যেন একটা অকৃত্রিমতা—একটা অপার্থিব সরলতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল! আমাকে মুখ তুলিয়া চাহিতে হইল,—দেখিলাম, মুখখানি—সুন্দর! ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়াছে,—আয়ত নেত্র আরও বিস্ফারিত হইয়াছে,—হাস্য জড়িত বদনমণ্ডলে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে কে ডাকিল "ও মা চারু, কতক্ষণ হ'ল নাইতে গেছিস, শিগ্‌গির

করে আয় মা!”

চারু “যাই মা” বলিয়া কলসীটি কক্ষে লইয়া আমারই বাসার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিল। আমিও সত্বর স্নান শেষ করিয়া বাসায় আসিলাম।

মহেন্দ্র সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল,—আমি পাক বসাইয়া দিলাম। যদিও আমার বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য কিছুই ছিল না তথাপি যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইল। ইন্ধনের ধূমে,—উত্তপ্ত জলের বাষ্পে মাঝে মাঝে আমার চক্ষে জল আসিতেছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, “বাবু”! পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম সেই চঞ্চলা বালিকা—চারু! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কেন আমাকে ডাকিতেছ, আমাকে কি কিছু প্রয়োজন আছে?”

চারু বলিল “আমি আপনার নিকট কলিকাতার গল্প শুনিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু একি,—আপনার এখনও খাওয়া হয় নাই! আর আপনি রাঁধিতেছেন কেন,—আপনার কি রাঁধিয়া দিবার কোন লোক নাই?”

আমি সেই বালিকার অনধিকার চর্চ্চায় একটু বিরক্ত হইলাম। কিন্তু কি জানি কেন, সেই প্রগল্‌ভা বালিকার সরল প্রশ্নে উত্তর দিতে হইল; বলিলাম “আমি বিদেশী, সবে মাত্র আজ আসিয়াছি, শুনিলাম এখানে ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, এ ব্রাহ্মণের আর কে পাক করিয়া দিবে?”

বালিকা আপনার কম্বুগ্রীবা উন্নত করিয়া উজ্জল নেত্র-দ্বয়কে অধিকতর বিস্ফারিত করিয়া বলিল “কেন আমরা ব্রাহ্মণ,

আপনি আমাদের বাটীতে আহারাদি করিবেন! আপনার রাঁধিতে কষ্ট হইতেছে,—চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে,—এমন করিয়া কয় দিন চলিবে ?"

বালিকার নিকট নয়ন জল গোপন করিতে পারিলাম না, সত্বর অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলাম। চারু ছুটিয়া বাহিরে গেল, আবার অল্পকাল পরে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িল, মাথার চুল এলাইয়া গেল, পিঠের কাপড় খুলিয়া গেল, আপনার অঞ্চলে মুখটি দুই হাতে চাপিয়া কেবলই হাসিতে লাগিল। আমি তাহাকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছু না বলিয়া কেবলই হাসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে শান্ত হইয়া আমাকে বলিল "মা রাজি হইয়াছেন, আজ সন্ধ্যা হইতে আপনাকে আমাদের বাটীতে খাইতে হইবে। বলুন বাবু,—আপনি স্বীকার হইয়াছেন কিনা বলুন ?"

বালিকার এই আগ্রহ দেখিয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইল। তাহার পর চারু উঠিয়া আমাকে কাঠ আনিয়া দিল, জল গড়াইয়া দিল! এইরূপে জীবনের এই প্রথম দুর্দ্দিনে আমার ক্ষুদ্রা সহযোগীনী আমাকে অনেক সাহায্য করিল। একথা আমিত ইহজীবনে কিছুতেই ভুলিতে পারিব না, পরজীবনে মানবাত্মার যদি স্মৃতি বলিয়া কোন শক্তি থাকে তাহা হইলে পরজীবনেও একথা হৃদয়ে অহঃরহঃ জাগরূক থাকিবে।

আহারের পর ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য শয্যায় আশ্রয় লইলাম, চারু তাম্বুল আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন ভাবিতে

লাগিলাম,— এই যে বালিকা, ইহার হৃদয় কত উচ্চ, কত মহৎ, যাহাকে প্রথমে আমি চঞ্চলা প্রগল্‌ভা বলিয়া স্থির করিয়া ছিলাম, এখন দেখিতেছি দয়ার কার্য্য করিতে সে কিছু ব্যস্ত, সহানুভূতির সরল বাক্যাবলী হইতেই তাহার প্রগল্‌ভতা দোষ! বালিকার কোমল হৃদয় খানি দয়ার উর্ব্বর কার্য্যক্ষেত্র! রূপ ও গুণের সামঞ্জস্য আমিত এরূপ আর কোথাও দেখি নাই! এত অপার্থিব দয়া,— এত অযাচিত অনুগ্রহ,— এ বিদেশীর ক্লেশে—এ অপরিচিতের কষ্টে এত হৃদয়ঢালা সহানুভূতি আর ত কোথাও দেখিতে পাই নাই! আর কেনই বা না হইবে?— এত রূপ যাহার, তাহার এত গুণ কেন না থাকিবে!

মহেন্দ্র আসিয়া যখন আমাকে জাগাইল তখন বেলা ৪ টা বাজিয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া অফিসে গেলাম। সে দিন আর বেশী কিছু কাজ হইল না, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্যাসের চার্জ্জ বুঝিয়া লইলাম। যে সামান্য কাজকর্ম্ম ছিল তাহা শেষ করিয়া কলিকাতার ডাক পাঠাইয়া দিয়া সকালে সকালে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পরেই বাসায় ফিরিয়াছিলাম। অফিসের ৪।৫ জন লোক— যাহাদের সহিত এখনও আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই— তাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাসায় বসিয়াছিল, বলা বাহুল্য মহেন্দ্র নাথও ছিল। অনেক্ষণ কথাবার্ত্তা গল্পগুজবের পর সকলেই চলিয়া গেল। আমি হ্যারিকেনের আলোটা নিকটে লইয়া নিজের দৈনিক-কার্য্য-বিবরণী লিখিয়া কলিকাতার বাটীতে পত্র লিখিতে বসিলাম। ইতি মধ্যে

কখন চারু আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। পত্র লেখা শেষ হইলে, যখন আমি মুখ ফিরাইলাম, তখন দেখিলাম,—চারু! চারু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু, আপনার মা নাই?"

আমি "মা কি সকলের থাকে?"

চারু "আমার কিন্তু মা আছে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার আর কে আছে?"

বালিকা তখন আমার চৌকির এক পার্শ্বে বসিল। তাহার সেই উজ্জ্বল নয়ন দুইটি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল "কই আর কে আছে,—আমাদের ত আর কেহ নাই!"

আমি "আর কেহই নাই!"

চারু "আমি ত আর কাহাকেও কখন দেখি নাই; তবে মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, কলিকাতায় আমার এক মেস মহাশয় আছেন, তিনি পূর্ব্বে কখন কখন আমাদের সংবাদ লইতেন, মাঝে মাঝে কিছু কিছু খরচও পাঠাইতেন, কিন্তু প্রায় দুই বৎসর হইল তিনি আর কোন সংবাদ লয়েন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহা হইলে তোমাদের চলে কি করিয়া?"

বালিকা তাহার সরল কণ্ঠে সরল ভাষায় উত্তর করিল "আমি জানিব কেমন করিয়া—মা জানেন!" সে স্বরে কোন কৃত্রিমতা ছিল না, মুখে কোন গোপনের ভাব ছিল না। আমি দেখিলাম, বালিকার মাতা বালিকাকে সংসারের কোন অভাব

জানিতে দেন নাই। এমন সময় কে বাহির হইতে ডাকিল "চারু!"

চারু "কেন মা" বলিয়া সত্বর বাহিরে গেল। বুঝিলাম চারুর মাতা, সেইরূপ ধীর কণ্ঠে নিম্নস্বরে বলিলেন "কতক্ষণ আসিয়াছ,—বাবুকে ডাকিয়া আন, খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" আমি সমস্ত কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আমার তখন মনে হইল, আমি যে চারুকে তাহাদের সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হয়ত মাতা তাহা শুনিতে পাইয়াছেন,—হয়ত আমার এই অনধিকার চর্চ্চায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; তখন একটা আপনা আপনি প্রশ্ন মনে হইল, "আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি?"

যাহা হউক এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই চারু আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি উঠিয়া চারুর সহিত তাহাদের বাটীতে গেলাম। চারুর মা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত বদনে আমি যে স্থানে আহার করিতে বসিয়াছিলাম তাহারই এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। চারু আমার সম্মুখে বসিয়াছিল। চারুর মার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। সে রাত্রে তাঁহার সহিত আমার আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না; কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম,—এরূপ হইলে চলিবে না; তাঁহাকে আমার সহিত কথা কহিতে হইবে। তাঁহারা যেমন আমার সহিত সরল ব্যবহার করিতেছেন, আমিও সেইরূপ ব্যবহার করিব, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এ পার্থক্যটুকু থাকিবে না।

দিনের বেলায় আমার বিশেষ কোন কাজ ছিল না। প্রাতে ঘণ্টা দুই কেবল অফিসে যাইতে হইত, আর সন্ধ্যার পর যাইয়া

কোন দিন দুই ঘণ্টা কোন দিন তিন ঘণ্টা কাজ করিলেই হইত। সুতরাং সমস্ত দিন আমি একরূপ প্রায় নিষ্কর্ম্মা থাকিতাম। সেখানে তেমন কোন লোক ছিল না যাহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সময় কাটান যাইতে পারে; লোকের মধ্যে কয়েক জন দোকানী, তাহারা আপনার কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত! আমাকে সমস্ত দিনটা কখন বাসায় কখন চারুদের বাটিতে থাকিয়া কাটাইতে হইত। চারুর মা আমাকে প্রথম প্রথম একটু লজ্জা করিতেন; কিন্তু পরে আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম সেইরূপ ঘটিল। মায়ের আর সেরূপ লজ্জিত ভাব রহিল না। তিনি আমার সহিত বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

অল্পে অল্পে সমস্ত কথা শুনিলাম। সংসারের অভাব, দুঃখ, দৈন্য সমস্ত শুনিলাম। এ স্থানে চারুর পিতার পৈতৃক বাসস্থান নহে, তিনি এই দেশীয় এক জমীদারের তরফে কর্ম্ম করিতেন। সর্ব্বদা এদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি এই গ্রামে বাসোপযোগী এক গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং অনেক জমীজমা করিয়া দেশের আশা ছাড়িয়া দিয়া এ স্থানে সস্ত্রীক বাস করিতে থাকেন। চারুর জন্ম এই দেশে হইয়াছিল। এক বৎসর আশ্বিন মাসে চারুর পিতা অন্য এক তালুক হইতে আশ্বিন কিস্তির খাজনা আদায় করিয়া সদর কাছারিতে ফিরিতেছিলেন; পথি মধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়া দস্যুতে সেই অর্থ হস্তগত করে। যখন চারুর পিতার এইরূপ অকালে অস্বাভাবিক রূপে মৃত্যু হইল, তখন চারুর বয়ঃক্রম ৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর পুলিসের হাঙ্গামে পড়িয়া

চারুর মায়ের কিছু ব্যয় হয়; তাহার পর শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। এ সমস্তের পরেও যাহা কিছু ছিল, তাহাতে তাঁহাদের দুই জনার ভরণপোষণ অনায়াসে চলিত, কিন্তু স্ত্রীলোক পাইয়া একজন তাঁহার কিছু জমী ইজারা করিয়া লইয়া পরিশেষে সে সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করিল। তিনি স্ত্রীলোক, একাকী কি করিবেন; এই প্রতারণা নীরবে সহ্য করিলেন। চারুর পিতার মৃত্যুর পর দেশের কোন আত্মীয়ের নিকট পত্র লিখিয়া সংবাদ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে পত্রের কোন উত্তর আসে নাই। কলিকাতায় চারুর এক মাসী ছিলেন, এই দুর্ঘটনার পর তিনি প্রায়ই পত্রাদি লিখিতেন ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সাহায্যও করিতেন। প্রায় বৎসর দুই হইল চারুর সে মাসী মারা গিয়াছেন; কলিকাতার মেসো মহাশয় আর বড় সংবাদ লয়েন না। এখন এই বন্ধু-বান্ধব শূন্য দেশে দুইটি প্রাণী কায় ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

চারুর মাকে আমিও 'মা' বলিয়া ডাকিতাম। এই সমস্ত কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন "বাবা, আমার দিন এরূপ ফুরাইয়াছে আর কয়টা দিনই বা বাঁচিব, কিন্তু চারুর জন্যই ভাবিয়া পাগল হইয়াছি। এই বন্ধুহীন দেশে চারুর বিবাহ কেমন করিয়া দিব; চারু এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এগার বৎসরে পড়িয়াছে,—বিবাহের কিছুই ঠিকানা নাই। আমি স্ত্রীলোক,—পাত্র অনুসন্ধানের ক্ষমতা আমার নাই; মনে করিয়াছিলাম কলিকাতা কিম্বা দেশে যাইয়া পাঁচজনকে ধরিয়া বিবাহের পাত্র অনুসন্ধান করিব; কিন্তু আবার

পাঁচদিক ভাবিতে হইল। এখানে চারুকে দুই বেলা দুই মুঠা পেট পূরিয়া খাইতে দিতে পারিতেছি, কিন্তু কলিকাতা বা দেশে যাইয়া কাহার বাড়ী গিয়া উঠিব,—কে দুই বেলা চারুকে দুই মুঠা খাইতে দিবে। আমরা থাকিতে লোকে জমাজমী যাহা ছিল ঠকাইয়া লইতেছে,—আমরা এখান হইতে সরিয়া যাইলে এখানকার আশা ভরসা সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি আর এক বার দেশে কিম্বা কলিকাতায় পত্র লিখিলেন না কেন।"

তিনি বলিলেন "তুমি আসিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আর এক খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাই নাই"

সে দিনের কথা এই পর্য্যন্ত।

মধ্যে মধ্যে চারুদের কথা আমাকে ভাবিতে হইত। তাহাদের সাংসারিক কষ্টের কথা,—তাহাদের বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশ বাসের কথা,—অবিবাহিতা চারুর বিবাহের কথা,—চারুর মা ও চারুর সরল ব্যবহারের কথা,—একজন অপরিচিত বিদেশীর প্রতি তাহাদের অযাচিত অনুগ্রহের কথা,—প্রায়ই আমার মনে হইত।

ভাদ্রমাস হইতে আমদের কাজের বড় ভিড় বাড়িল। সকাল বেলার সেই দুই ঘণ্টা কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু রাত্রের কাজ বাড়িল। আমাদের এজেন্সীটাই হেড অফিস ছিল, ইহার অধীনে ১২।১৩ টা সাব-এজেন্সী ছিল। সমস্ত এজেন্সী গুলিতে কাজ খুব জোরে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর কিছু জলযোগ করিয়া

অফিসে আসিয়া বসিতাম, তাহার পর সমস্ত সাব-এজেন্সীর কাগজ পত্র ঠিক করিয়া সদর অফিসের কাগজ পত্র ঠিক করিতে, কলিকাতার ডাক রওনা করিয়া দিতে, কোন কোন দিন রাত্রি প্রায় ১২ টা বাজিয়া যাইত; কিন্তু বাসায় যাইয়া দেখিতাম চারু তখনও ঘুমায় নাই। কোন কোন দিন চারুর মা ঘুমাইয়া পড়িতেন,—কিন্তু চারু দ্বারে মাথা রাখিয়া তখনও বসিয়া আছে, চক্ষে ঘুম আসিয়াছে কিন্তু ঘুমায় নাই, সামান্য শব্দে তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে সতৃষ্ণ নয়নে দ্বারের দিকে চাহিতেছে! চারু আমার পদশব্দ উত্তমরূপে চিনিত; বাহিরে আমার পদশব্দ শুনিয়া অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালিত; পাত্রে অন্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিত. আমি একদৃষ্টে তাহার কার্য্য দেখিতাম। সে একখানি আসন পাতিয়া স্থান পরিষ্কার করিত.—জলপূর্ণ গ্লাস আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিত, তাহার পর অন্নের পাত্র ধরিয়া দিয়া আমার দিকে তাকাইত। আমি আহারে বসিলে চারু আমার নিকট বসিয়া কোন ব্যঞ্জন কিরূপ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিত। চারু কোন্ ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছে তাহা আমি প্রথমে জানিয়া লইতাম, তাহার পর সেই ব্যঞ্জনের নিন্দা করিতাম। আমার কথা শুনিয়া চারু তাহার সেই ক্ষীণ ঈষৎরক্তিম অধরকে শুভ্র দন্তস্পৃষ্ট করিয়া আমার দিকে ভ্রূকুটি করিত,—আমাকে নির্ব্বাক তিরস্কার করিত। আমার আহার শেষ হইতে না হইতে মুখ হাত ধুইবার জল ঠিক করিয়া রাখিত, আহারের পর তাম্বুল আনিয়া দিত। আমি কোন কোন দিন এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে তিরস্কার

করিতাম, -চারুর সরল হাস্যস্রোতে আমার সমস্ত তিরস্কার ভাসিয়া যাইত।

মধ্যাহ্নকালের আহারাদির পর চারু তাহার জীর্ণ কথামালা খানি আমার নিকট আনিয়া পাঠ বলিয়া লইত। আমার পকেট বুকে তাহার সেই মোটা মোটা হস্তাক্ষরে যেখানে সেখানে লিখিয়া রাখিত "শ্রীমতী চারুবালা দেবী"। তিরস্কার করিলে আমার মুখের দিকে চাহিত, এবং আর কখন সেরূপ দোষ করিবে না বলিয়া ক্ষমা চাহিত ;—কিন্তু আবার সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া লিখিয়া ফেলিত।

চারুর মুখখানি কেমন সুন্দর! তাহার চঞ্চল চক্ষুর শান্ত দৃষ্টি কেমন সুন্দর! তাহার সরল ব্যবহার,—জীবে দয়া আরও কত সুন্দর! আত্মদোষ গোপন করা যুক্তিযুক্ত নহে—আমি চারুকে ভালবাসিয়াছি!—তাহাতে আমার অপরাধ আছে কি? চারুর মুখখানিতে একটি আকর্ষণ শক্তি ছিল—দৃষ্টিতে একটা অনির্বচনীয় ঔজ্জ্বল্য ছিল! সে মুখ, সে চোখ যে দেখিয়াছে,—সেই তাহাকে ভালবাসিয়াছে। চাষীরা তাহাদিগকে নানাবিধ ফলমূল বিনামূল্যে দিয়া যাইত, মজুরেরা তাহাদের বাটীতে অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া যাইত, দোকানীরা তাহাদিগকে সময়ে সময়ে বিবিধ উপায়ে সাহায্য করিত,—কারণ তাহারা চারুকে ভাল বাসিত। আমিও চারুকে প্রথমে সেইরূপ ভালবাসিয়া ছিলাম, কিন্তু পরিশেষে সেই ভালবাসা আমার অজানিতে প্রণয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—আমি চারুকে ভালবাসিয়াছি!

চারুকে বিবাহ করিব বলিয়া স্থির করিলাম ; কিন্তু এ বিষয়ে মা'র অভিমত আছে কিনা জানিতে হইবে। যদি তাঁহার অনুমত হয় তবে এ প্রণয়কে অঙ্কুর অবস্থাতেই মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে ; সুতরাং সত্বরেই মায়ের মত জানা আবশ্যক। একদিন দ্বিপ্রহরে সাহসে বুক বাঁধিয়া মাকে ভয়ে ভয়ে সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিলাম। মা প্রথমে কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া যখন মুখ তুলিলেন, তখন দেখিলাম,—তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে ; অঞ্চলে অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন "বাবা সুশীল, জগদীশ্বর দয়া করিয়া চারুর সদগতির উপায় করিতেছেন, আমি কি তাহাতে অনুমত করিতে পারি—?" মা আরও কি বলিলেন, আমি শুনিয়াও সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। মায়ের প্রথম কথাতেই আমার হৃদয় আনন্দোদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ঘর হইতে বাহির হই, তখন দেখিলাম চারু দরজার পার্শ্ব হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল, বুঝিলাম চারুও সকল কথা শুনিয়াছে।

সেই দিন হইতে আমি লক্ষ্য করিলাম, আমার সাক্ষাতে চারু আর সেরূপ হাস্য করে না, সেরূপ বেশী কথা বলে না,—যেন সে আপনাকে গম্ভীর দেখাইবার চেষ্টা করে। চারু দ্বিপ্রহর কালে আমার নিকট পাঠ বলিয়া লওয়া বন্ধ করিল বটে, কিন্তু রাত্রি জাগিয়া আমার অপেক্ষা করা বন্ধ হইল না ; আমার সহিত কথা কম বলিত বটে, কিন্তু তাহার উজ্জ্বল নয়নের সতৃষ্ণ দৃষ্টিসংখ্যা কমিল না বরং বর্দ্ধিত হইল। স্থির করিলাম চারুকে বিবাহ করিয়া সুখী

হইব, কিন্তু তখনই মনে হইল,—বিবাহ করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদেশ আসিয়াছি, কিন্তু এই বিদেশ আগমনই আবার বিবাহের কারণ স্বরূপ হইল,—প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। চারুর প্রণয়ে প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া যাউক !—আমি চারুকে বিবাহ করিব।

মাঘ মাস আসিয়া পড়িল, আমাদের কাজও প্রায় একরূপ শেষ হইয়া আসিল। সকল কর্ম্মচারী একে একে বিদায় লইল। মহেন্দ্র বাড়ী গেল. যাইবার সময় আমাকে বার বার করিয়া বলিয়া গেল যেন আমি কলিকাতা যাইবার কালে একবার কুমিল্লা দেখিয়া তাহাদের বাড়ী হইয়া যাই। আরও বলিল, তাহাদের বাটীর নিকটেই চন্দ্রনাথতীর্থ, ঐ সময় চন্দ্রনাথতীর্থও দর্শন করা হইবে। আমি স্বীকার পাইয়া পকেট বুকে তাহার ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। আমাদের সাব-এজেন্সীর কাজ বন্ধ হইয়া আসিল, সুতরাং সেই সমস্ত সাব-এজেন্সীর হিসাব পত্র শেষ করিতে আমাকে ১৫।২০ দিনের জন্য মফঃস্বল যাইতে হইবে ঠিক হইল। চারু ও চারুর মাকে সকল কথা বলিলাম। আমি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসি তাঁহারা সেই কথা বলিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার ডাকে কলিকাতা হইতে আমার এক বন্ধুর পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন :—খুড়া মহাশয় আমার বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন, পাত্রী স্থির হইয়াছে, ১২ফাল্গুণ বিবাহের দিন। বন্ধু আমাকে "লিখিয়াছেন তোমার বিবাহের প্রীতি উপহারের জন্য আমাদের হইয়া একটা ভাল দেখিয়া কবিতা লিখিয়া পাঠাইবে।" পত্র পাইয়া মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; খুড়া

মহাশয় আমাকে বাল্যকাল হইতে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন,—লালন পালন করিয়াছেন,—সংসারে কর্ম্মঠ করিয়া তুলিয়াছেন, এখন তিনি আমার বিবাহের ঠিকঠাক করিতেছেন, আমি কেমন করিয়া তাহাতে অসম্মত করিব,—কেমন করিয়া তাঁহার অবাধ্য হইব! সন্ধ্যার সময় হইতে মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল। রাত্রে আহারে বসিলাম, চারু তাহার অভ্যাস অনুসারে আমার নিকটে বসিল। ১৫।২০ দিনের জন্য অন্যত্র যাইব সুতরাং চারু আজ যত্নের সহিত নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছে, কিন্তু আমার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছে না। চারু তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু, আজ কিছু খাইতেছেন না কেন?"

আমি "ভাল লাগিতেছে না"

দুঃখিত স্বরে চারু বলিল "কেন?"

চারুর মুখের দিকে চাহিলাম, সেও আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল—উভয়েই নির্ব্বাক! তৎপরে চারু মুখ অবনত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল। আমি বলিলাম "চারু, সেদিন মায়ে ও আমায় যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা শুনিয়াছ?"

চারু সেইরূপ অবনত মস্তকে বলিল "কি কথা?"

"আমি তোমাকে বিবাহ করিব মনে করিয়াছি, তাহাতে, তোমার মত আছে?"

কোন উত্তর নাই!

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি আমায় ভালবাস?"

কোন উত্তর নাই।

তখন ডাকিলাম, চারু!" চারু মুখ তুলিল, চারি চক্ষু এক হইল, আমার বক্ষধমণী দ্রুত স্পন্দিত হইল, দেখিলাম চারুর চক্ষু জলে ভাসিতেছে! আর আহার করা হইল না, উঠিয়া মুখ ধুইলাম, তখনও চারু কাঁদিতেছে; অঞ্চল দিয়া তাহার নয়ন মুছাইয়া দিলাম, তথাপি ক্রন্দন নিবারিত হইল না। চারু আমার বক্ষঃস্থলে তাহার মস্তক রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম "চারু, যদি বিবাহ করিতে হয় তবে তোমাকেই বিবাহ করিব।" চারু ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল "মনে রেখ!" সে আজ কতদিনের কথা, কিন্তু এখনও সে রাত্রের ঐ দুই কথা অহঃরহঃ হৃদয়ে জাগিতেছে!

খুড়া মহাশয় বিবাহের ঠিক করিতেছেন,—করুন! এখনও তাঁহার পত্রে কিছু জানিতে পারি নাই। আমি এই বার মফঃস্বল হইতে আসিয়া কাকাকে জানাইবার নিমিত্ত সেই বন্ধুকে সমস্ত খুলিয়া লিখিব;—ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা কি জানিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য করিব!

পর দিন মফঃস্বলে যাইতে হইল। সেখানকার কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া বার দিনের দিন সদর অফিসে ফিরিলাম। অফিসে পৌঁছিতেই সাহেব আমাকে এক টেলিগ্রাম দিলেন। খুড়া মহাশয় আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, সত্বর কলিকাতা যাইতে হইবে। সাহেব আরও বলিলেন, খুড়া মহাশয় তাঁহাকে এক পৃথক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার বিবাহ হইবে সেই জন্য আমাকে কিছু

দিনের ছুটি দিয়া কলিকাতা পাঠাইতে লিখিয়াছেন। আমার নামে টেলিগ্রাম সবে মাত্র গত কল্য রাত্রে আসিয়াছে।

টেলিগ্রাম খানিকে লইয়া বাসায় চলিলাম। বাসায় কাপড় ছাড়িয়া চারুকে ডাকিলাম; চারু আসিল না। পুনরায় ডাকিলাম, তথাপি আসিল না, বা কোনরূপ উত্তর পাইলাম না। তখন চারুদের বাটী গেলাম, গিয়া দেখিলাম,—কেহ কোথাও নাই! অন্যান্য দিন বেড়ায় কাপড় শুকাইত,—তাহা নাই! রান্নাঘরের বেড়ার দরজা ভাঙ্গিয়া কুক্কুরে হাঁড়ি বাহির করিয়া খাইতেছে, বড় ঘরে চাবী দেওয়া! এই সমস্ত দেখিয়া কি জানি কেন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 'চারু' 'চারু' বার বার উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম,—কোনও উত্তর পাইলাম না, বাহিরে আসিয়া ডাকিলাম,—কোন উত্তর নাই! যে দোকান হইতে চারুদের জিনিস পত্র যাইত সেই দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাহাতে সে বলিল, "৫।৬ দিন হইল কলিকাতা হইতে চারুর মেসো মহাশয় আসিয়া তাহা-দিগকে লইয়া গিয়াছেন, সেখানে চারুর বিবাহের স্থির হইয়াছে শীঘ্রই বিবাহ হইবে, আমাদের দোকানের সব হিসাব মিটাইয়া দিয়া গিয়াছে।

চারুর বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহারা কলিকাতা গিয়াছে শুনিয়া আমি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। চারুর বিবাহ! চারু পর-হস্তগতা হইবে! আমি শুনিয়াছিলাম চারুর মা আমার অসিবার পূর্ব্বে চারুর মেসো মহাশয়কে তাহার বিবাহের জন্য অনেক মিনতি করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই পত্র

পাইয়া তিনি বিবাহের সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া একেবারে আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। আমি আকাশ পাতাল, স্বর্গ মর্ত্ত্য কত কি ভাবিতে লাগিলাম, তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল "কি সর্ব্বনাশ চারুর বিবাহ!" দোকানী আমাকে মাটীতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি বাবু, মাটীতে বসিয়া আছেন একটা টুল আনিয়া দিব?" আমি 'না' বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম।

সাহেব আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "আমাদের এই অফিসের পান্‌সী তোমাকে ষ্টীমার ষ্টেশনে দিয়া আসিবে, আজই রাত্রে তুমি কলিকাতা রওনা হও!" আমি স্বীকার পাইলাম সত্য, কিন্তু কলিকাতা যাইতে কিছুতেই মন সরিল না। চারুর বিবাহ অপরের সহিত হইবে, আমার বিবাহ আর একটি বালিকার সহিত হইবে! না, তাহা কিছুতেই হইবে না! চারু, তুমি অপরকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পার হইও,—কিন্তু আমার জীবনের সুখ ফুরাইয়াছে! ষ্টেশনে যাইয়া একটা মতলব স্থির করিলাম; লগেজ গুলাকে কলিকাতায় বুক করিয়া রসিদ খানাকে কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম; এবং আপনার জন্য এক খানা চন্দ্রনাথের টিকিট কিনিলাম। আমার সঙ্গে যে দ্বারবান আসিয়াছিল, সে জানিল আমি কলিকাতা যাইতেছি।

মেঘনা নদীর ভাটিতে আসিয়া আজবপুর ষ্টেশনে নামিলাম, সেখান হইতে পদব্রজে ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে ষ্টীমারে আখৌড়া উপস্থিত হইলাম, আখৌড়া হইতে রেলে চড়িলাম। গাড়ী

কুমিল্লা ছাড়াইয়া লাক্সাম জংশনে উপস্থিত হইল ;—এই স্থানে গাড়ী বদলাইয়া সীতাকুণ্ডের গাড়ীতে চড়িতে হইবে, সুতরাং আমি ষ্টেশনে নামিলাম। প্লাট্‌ফরম্‌ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম মহেন্দ্র দক্ষিণ হস্তে ছাতা ও বামহস্তে একটও ব্যাগ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি প্রথমে মনে করিলাম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না; কিন্তু মহেন্দ্র আমাকে দেখিয়া অগ্রসর হইল, সুতরাং আমার পাশ কাটাইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "বাবু এদিকে কোথায়?" আমি চন্দ্রনাথ যাইব এই কথা বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কোথা হইতে আসিলে?" সে বলিল, তাহাকে কোন কার্য্য বশতঃ চাঁদপুর যাইতে হইয়াছিল, এখন বাটী যাইতেছে। আমাকে তাহাদের বাটী যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিল। আমি তাহাকে ফিরিবার সময় তাহাদের বাটী হইয়া যাইব, আশ্বাস দিয়া সীতাকুণ্ডের গাড়ীতে উঠিলাম। সেও আমার কথা বিশ্বাস করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

প্রাতঃকালে গাড়ী সীতাকুণ্ড পৌছিল। ষ্টেশনে নামিয়া একটি দোকানে আশ্রয় লইলাম। সেই স্থানে স্নান আহার শেষ করিয়া অপরাহ্নে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, কিন্তু সে অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার এ অসংযত প্রাণকে লইয়া সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। সেই সময় শিবরাত্রি উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে সন্ন্যাসী মহান্তেরা চন্দ্রনাথ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইতেছিল।

আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। চন্দ্রনাথ, বাড়বানল লবণাক্ষ, ব্যাসকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সহস্রধারা, জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি কত তীর্থ বর্ত্তমান। সাধুসঙ্গে, তীর্থ দর্শনে ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে হৃদয়ের ক্লেদ অনেকটা অপনীত হইল;—কিন্তু অন্যমনস্কে যখনই চারুর মুখ মনে হইত, তখনই যেন কে হৃদয়ে অগ্নি ঢালিয়া দিত।

এইরূপে অনেক দিন কাটিল। আজ ১২ ই ফাল্গুন,—আজ আমার বিবাহের দিন, কিন্তু আমি কোথায়। অদ্য রাত্রে শুভলগ্নে হয়ত চারুর শুভবিবাহ হইয়া যাইবে! প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। প্রাণের জ্বালা কমাইবার জন্য চন্দ্রনাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি, মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া সে আমার দুই হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর আমাকে টানিয়া বাহিরে আনিল! আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহেন্দ্রকে বলিলাম,—“মহেন্দ্র, আমার হাত ছাড়, হাতে বড় লাগিতেছে—ব্যাপার কি হইয়াছে বল।”

মহেন্দ্র বলিল „আপনি বাটীতে কোন সংবাদ না দিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছেন।” আমার মাথা তখন ঝাঁঝাঁ করিতে লাগিল,—আমি তখন সমস্ত বুঝিতে পারিলাম।

মহেন্দ্র আমাকে একটা দোকানে লইয়া গেল, সেখানে যাইয়া দেখিলাম, দাদা! তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না। দাদা প্রথমে আমাকে মৃদু মৃদু তিরস্কার করিলেন,—অধিক কিছু বলিলেন না। পরে আমি মহেন্দ্রের মুখ হইতে শুনিলাম—ব্যাপারটা এইরূপ ঘটিয়াছিল;—[illegible] [illegible] [illegible] রসিদ খানি

ডাকে কলিকাতায় পৌঁছিল, বাটীর লোকে কিন্তু আমার সংবাদ পাইলেন না, তখন ম্যানেজার সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম আসিল। তিনি তদুত্তরে 'আমি কলিকাতা রওনা হইয়াছি' সংবাদ দিলেন। তখন বাটীর লোকে অত্যন্ত ভাবিত হইয়া উঠিলেন; যেদিন সাহেবের টেলিগ্রাম কলিকাতার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল, সেইদিন রাত্রেই দাদা সদর অফিসের উদ্দেশে রওনা হইলেন। যে দ্বারবান আমার সহিত ষ্টীমারষ্টেশনে গিয়াছিল, সে বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। দাদা ষ্টীমার ষ্টেশনে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন যে, ** "তারিখে যে ব্যক্তি কলিকাতায় কতকগুলি ল্যাগেজ বুক করেন, সেই তারিখে তিনি একখানি সীতাকুণ্ডের টিকিট কিনিয়াছিলেন।" এই সংবাদ অবগত হইয়াই দাদা মহেন্দ্রকে টেলিগ্রাম করেন; কারণ তিনি অফিস হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন,—মহেন্দ্রের বাটী ঐ অঞ্চলে। তিনি মনে করিয়াছিলেন হয়ত আমি মহেন্দ্রের বাটী গিয়াছি। মহেন্দ্র টেলিগ্রামের উত্তরে তাঁহাকে তাহার বাটী যাইতে লিখে। সেখান হইতে তাঁহারা চন্দ্রনাথে আসিয়াছেন। আমরা সেইদিনেই কলিকাতা রওনা হইলাম; মহেন্দ্রও সঙ্গে আসিল।

১৪ই প্রাতঃকালে আমরা কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম বিবাহের সমস্তই ঠিক ছিল, কেবল আমি না আসাতেই সমস্ত গোল বাধিয়া গিয়াছিল। ১৪ই বিবাহের দিন আছে দেখিয়া সেই দিনই বিবাহ হইবে স্থির হইল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। অপরে বসিতে বলিলে বসি, অপরে উঠিতে বলিলে উঠি, অন্তে

খাইতে বলিলে খাই ! আমি যেন কলের পুতুল, অপরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেছি মাত্র।

সমস্তদিন চারুর সেই মুখখানি মনে করিয়া কাঁদিয়াছি,—চারুর সেই ক্রন্দন-জড়িত-কণ্ঠের 'মনে রেখ' কথা দুইটি মনে করিয়া কাঁদিয়াছি,—এ কি হইল ! চারু চারু তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম.—'যদি বিবাহ করিতে হয় তবে তোমাকেই বিবাহ করিব।' কিন্তু এই কি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ! তোমার নিকট অবিশ্বাসী হইবার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হইল না ! চারু চারু একি করিল—এমন কেন হইল !!

বিবাহের সময় পুরোহিত শুভদৃষ্টি করিবার জন্য বলিলেন, কিন্তু চক্ষু চাহিতে সাহস হইল না, ভাবিলাম, :— যে চক্ষু একদিন চারুর চক্ষুর সহিত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্থানকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিল আজ সেই চক্ষু কেমন করিয়া একটি অপরিচিত বালিকার চক্ষের মধ্যদিয়া তাহার অপরিচিত হৃদয়ের দারুণ অন্ধকার নিরীক্ষণ করিবে ! আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম।

বিবাহের পর বাসরে শয়ন করিলাম। বোধ হয় সেস্থানে আমাকে উত্যক্ত করিবার কোন লোক ছিলনা। সেজন্য প্রাণ-ভরিয়া কাঁদিবার অবসর পাইয়াছিলাম। এই কি অদৃষ্টে ছিল ! ভগবান্ ইহাই যদি অদৃষ্টে লিখিয়াছিলে তবে কেন সেই সরলতা-মাখা হৃদয় খানি—দয়ার আধার হৃদয় খানি—আমার নয়ন পথবর্ত্তী করিয়াছিলে ! যদি দুইটি জীবন এত ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করিবে, তবে দুইটি প্রাণকে আত্মহারা করিবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন

করিয়াছিলে কেন ? 'চারু' 'চারু' হৃদয়ের অনল-প্রবাহ নয়ন পথে জলধারারূপে গণ্ডস্থলকে প্লাবিত করিল।

আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি !

একখানি কোমল শীতল হস্ত নয়নের উত্তপ্ত অশ্রুকে মুছাইয়া লইল, একটি ক্ষুদ্র মস্তক বক্ষে লুণ্ঠিত হইল, তাহার পর চিরপরিচিত সেই মধুর কণ্ঠে ও কে ডাকিল "বাবু!" আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, এ কণ্ঠস্বর কাহার ? "চারু চারু তুমি ? তুমি এখানে ?"

"আমি বাবু, আমি কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম, আমার বিবাহ ; তখন মনে করিলাম আমাকে মরিতে হইবে ! তার পর যখন সমস্ত শুনিতে পাইলাম, যখন বুঝিতে পারিলাম, এ বিবাহ আমাদের প্রতিজ্ঞার অনুকূলে তখন প্রকৃতই আমি সুখী হইয়া ছিলাম। কিন্তু বাবু, তুমি কাঁন্দিতেছ কেন ? বল বাবু, তোমার চক্ষে জল কেন ?"

"কই চারু, আমি কাঁন্দিতেছি ? আমার চক্ষে জল ?"

* * *

সুখের স্বপ্ন আমাকে আত্মহারা করিতেছে, লেখনী হস্ত-ভ্রষ্ট হইতেছে ! "চারু চারু, দাও, লেখনী কাড়িয়া লইও না, হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে দাও, তোমার অনন্ত প্রেমের বর্ণনা করিতে দাও, আবার আবার—"

চারু আবার সেই সুক্ষ্ম অধরকে শুভ্রদন্তস্পৃষ্ট করিয়া, উজ্জ্বল নয়নে ভ্রূকুটি করিয়া আমাকে তাহার ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র মুষ্টি দেখাইয়া লেখনী বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল !!

চিঠি পড়া শেষ করিয়া হিরণ বলিল "তুমি ও তবে আমার সঙ্গে যাচ্ছ?" আমি বলিলাম "আমি এখন যেতে পারব না, হিসাব নিকাশের সময়। নরেশের কলেজের ছুটি আছে, সে তোমার সঙ্গে যাবে।"

"কেন, তুমিও ত মেজ দাদাকে মোটেই দেখ নাই; এখন চল না? এখানে ঠাকুরপো রইল।"

"নরেশকে দিয়া এখানকার কাজ হ'বার নয়; আমি এর পর যাব এখন।"

তাহার পরদিন হিরণকে লইয়া নরেশ মধুপুর রওনা হইল, মধুপুরের নিকটেই হিরণের পিত্রালয়। আমি সঙ্গে যাইয়া তাহাদিগকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিলাম, যাইবার সময় হিরণ আমাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গেল যেন আমি এরই মধ্যে একবার মধুপুর যাই। সে থাকিতে দিনগুলা যত শীঘ্র কাটিয়া যাইত, এখন যেন তত শীঘ্র কাটে না। সুতরাং এই সুদীর্ঘ দিনগুলার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য স্থির করিলাম, হাতের কাজ শেষ হইলেই ইত্যবসরে একবার তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিব এবং ফিরিবার মুখে হয়ত হিরণের নিকট দিয়া আসিব।

একথা নরেশ ব্যতীত বাটীর আর কেহ জানিল না; বা আর কাহাকেও জানাইবার তত আবশ্যক ছিল না। হিরণকেও জানাইলাম না যে আমি তীর্থভ্রমণে যাইব স্থির করিয়াছি। একটা শুভদিন দেখিয়া কিছু টাকা লইয়া নরেশকে সমস্ত বলিয়া কহিয়া বাহির হইলাম; কেমন একটা খেয়াল হইল, কাহাকেও

সঙ্গে লইলাম না। ষ্টেশনে আসিয়া বাটীর পুরাণ চাকর রামলালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বাটীর কোন কাজে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু আপনি কোন্ গাড়ীতে যাবেন ?" আমি বলিলাম "এখান হইতে বর্দ্ধমানে যাইয়া পাঞ্জাব মেলে চড়িব।" রামলাল সঙ্গে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। আমার নিকট মোগলসরাইয়ের সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট ছিল।

বর্দ্ধমানে মেলে উঠিয়া আমি একটু নিদ্রার ব্যবস্থা করিলাম। সেদিন কিছু বেশী গ্রীষ্ম বোধ হইতেছিল ; কামরার সমস্ত জানালা খড়খড়ি খুলিয়া দিয়া টাকাগুলি একটু সাবধান করিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলাম, অল্পক্ষণ মধ্যেই তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ একটা কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, আমার কামরায় একটি হিন্দুস্থানী যুবক ও একটি হিন্দুস্থানী যুবতী উঠিয়াছেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ বুঝিতে পারিয়া যুবতী তাঁহার অবগুণ্ঠন আরও দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিলেন এবং গাত্রবস্ত্রে দেহ-খানি ভাল করিয়া ঢাকা দিয়া লইলেন। যুবক তখন নিবিষ্টচিত্তে সিগারেটের ধূম পান করিতে ছিলেন। ধূমের তীব্রগন্ধে আমাকে উঠিয়া বসিতে হইল। বেশভূষা দেখিয়া বোধ হইল উভয়েই ভদ্র-বংশসম্ভূত। আমাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া যুবক তাহার একটি সিগারেট দিয়া বলিল "বাবুজি পিয়েঙ্গে ?"

আমি ধূমপান করি না বলিয়া তাহা ফিরাইয়া দিলাম। যুবক

আর কোন কথা বলিল না। আমি একবার সেই শ্বশ্রুগুম্ফসমন্বিত যুবকের মুখের দিকে, একবার সেই সুন্দরী যুবতীর সুবর্ণ খচিত উজ্জ্বল হস্তের দিকে, আবার নির্ম্মল নীলনক্ষত্রবেষ্টিত আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলাম। যুবককে যুবতীর সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করা অনধিকারচর্চ্চা বুঝিয়া নীরবে রহিলাম। গাড়ী যখন মোকামাঘাটে আসিয়া থামিল, তখন যুবক দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন এবং "বরফ্ বরফ্, লিমনেড্ লিমনেড্" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ; কিন্তু তত রাত্রে বরফ্ বা লিমনেড পাওয়া গেল না। "বাবুজি মেরা বহিন্‌কো জেরা দেখিয়ে, হাম পানি লেকে য্যাবি্য আতা হ্যায়" বলিয়া আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন।

এদিকে অল্পক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল ; যুবক তখনও আসিলেন না, যুবতী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, আমি "বাবুজি বাবুজি" করিয়া কত ডাকাডাকি করিলাম ; কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল ; আমি মহাবিপদে পড়িলাম। যুবতী কাতর কণ্ঠে বলিলেন "বাবুজি মেরা ভেইয়া !" সেই ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে বড় মিষ্ট শুনাইল ; কিন্তু সে মিষ্টত্ব অনুভব করিবার সময় ছিল না, আমার মাথা তখন ঘুরিতে ছিল। আমি যুবতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম "তিনি গাড়ীতে ঠিক উঠিয়াছেন, পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমাদের এ কামরায় আসিবেন।" আশ্বাস দিলাম সত্য, কিন্তু আমার নিজের কথাতেই আমার বিশ্বাস হইতেছিল না।

গাড়ী বাঁকীপুরে আসিয়া থামিল। কিন্তু যুবক আসিল না; তাহার পরিবর্ত্তে আসিল একজন পুলিস ইনেস্পেক্টর। অঙ্গে কোটপ্যাণ্টালুন, মাথায় টুপি, হাতে ছড়ি ফ্রেঞ্চ ফ্যাসনের দাড়ি। আসিয়াই গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিল আমি বলিলাম "এ কামরায় স্ত্রীলোক আছেন।"

ইনেস্পেক্টর "Very good, but it is not for females" বলিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন এবং যে বেঞ্চে সেই হিন্দুস্থানী রমণী বসিয়া ছিলেন, সেই বেঞ্চে তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। যুবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার বেঞ্চে আসিয়া বসিলেন। আমি দেখিলাম, ইনি একজন পুলিস বটেন!

গাড়ী আবার ছাড়িল। ইনেস্পেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি আপনার স্ত্রী"? পুলিশের লোকগুলা কথার মাত্রা রাখিয়া কথা কহিতে জানে না। আমি তাহাকে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া ইনেস্পেক্টর তাহার বিশাল জানুদেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "By jove, এটি আপনার কোন আত্মীয়া নন!"

আমি বলিলাম "না।"

ইনেস্পেক্টর "My God, there is some mystery."

আমি দেখিলাম "বিপদ্ ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে; বুঝিলাম সমস্ত বলিয়া ভাল করি নাই।"

আমি বলিলাম "আপনি ওসব কি কথা বলিতেছেন?"

ইনেস্পেক্টর "আর বলাবলি কি, এখন গাড়ী থামিলেই থামার

যেতে হবে।”

থানার নাম শুনিয়াই রমণী কাতরকণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করিয়া সভয়ে আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; আমি বলিলাম “আপনি ভয় পাবেন না, আপনার দাদার সংবাদ লইবার জন্য আমাদিগকে এই ষ্টেশনে নামিতেই হইত।” তাহার পর ইনেস্পেক্টরকে বলিলাম—“এখন কম করিয়া আপনার কত টাকার প্রয়োজন বলুন দেখি!” পুলিসের লোক টাকার খাতির রাখিতে জানে।

ইনেস্পেক্টর “এই ষ্টেশনে নামিয়া চলুন, রেলওয়ে পুলিশের হাতে না দিয়া আপনাদিগকে আমার থানায় লইয়া যাইতেছি., সেখানে ব্যাপার বুঝিয়া টাকার কথা বলিব।” সুরটা অনেক নামিয়াছে। আমিও তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম।

গাড়ী দানাপুরে আসিয়া থামিল। আমরা নামিয়া পড়িলাম। বিপন্না যুবতীকে অতি সন্তর্পণে নামাইয়া লইলাম। ইনেস্পেক্টরের সে সব পরিচিত স্থান, ডাকিবামাত্রই পাল্কী আসিয়া পড়িল। রমণীকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমরা পদব্রজে থানাভিমুখে চলিলাম। থানা নিকটেই, এই থানার তিনিই ইনেস্পেক্টর। থানার ভিতরের একটা কামরায় আমাকে উপস্থিত করা হইল। যুবতী পূর্ব্বেই পৌছিয়া ছিলেন। কি কুক্ষণেই বাটী হইতে রওনা হইয়া ছিলাম, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা কে খণ্ডন করিবে।

ইনেস্পেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনার বাড়ী কোথায়?”

আমি বলিলাম "হুগলি জেলা,—বাসদেবপুর।"

ইনেস্পেক্টর "আপনার নাম কি ?"

আমি "শ্রীগণেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী"

ইনেস্পেক্টর "আপনি এই স্ত্রীলোকটিকে চেনেন ?

আমি বলিলাম "না।"

ইনেস্পেক্টর "এখন আর না বলিলে চলে কি মহাশয় ! আপনি একে চেনেন এবং চেনা ছেড়ে আরও বেশী কিছু ! এখন যে টাকার কথাটা হয়েছিল, সেটা সম্বন্ধে কি বলুন দেখি, তা'হলেও কতক রক্ষা।"

আমি "বলিলাম, আমার নিকট সর্ব্বশুদ্ধ এই ৫০০ শ টাকা আছে, এইটা নিয়ে এখন এ লাঞ্ছনা হ'তে অব্যাহতি দেন।"

তখনই ১০৲ টাকার ৫০ কেতা নোট গণিয়া দিলাম।

ইনেস্পেক্টর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম ?"

রমণী "শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।"

আশ্চর্য্য হইলাম, "হিরণ্ময়ী হিরণ ?"

ইনেস্পেক্টর আমাকে বাধা দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "স্বামীর কিম্বা কোন আত্মীয়ের নাম নাম ?"

রমণী "আমার দেবর শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী।"

"হিরণ তুমি !" অবগুণ্ঠন খুলিয়া হিরণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম "হিরণ, একি রহস্য ?"

হিরণ "রহস্য আর কি, তুমি সন্ন্যাসী হচ্ছিলে,—আমরা ফিরিয়ে আন্লুম।"

"আমি সন্ন্যাসী হ'তে যাচ্ছিলুম, তোমায় কে বল্লে ?"

"কেন, রামলাল টেলিগ্রাম করেছিল, তুমি পঞ্জাবমেলে রওনা হয়েছ, সেই জন্য মেজদাদাকে নিয়ে মধুপুর ষ্টেশনে মেলে তোমার কামরায় উঠি, তখন তুমি ঘুমুচ্ছ।"

"তোমার দাদা আসান্‌শোলে নেমে গেলেন কেন ?"

"আসান্‌শোলে নেমে বাঁকীপুরে পুলিশ ইনেস্পেক্টর সেজে উঠলেন। কিন্তু সেই সময় আমার বড় ভয় হয়েছিল, যদি এ পুলিস ইনেস্পেক্টর আমার মেজ দাদা না হয়।"

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি ইনেস্পেক্টর সাহেব কখন চলিয়া গিয়াছেন। আমি হিরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার দাদা বুঝি এই থানার ইনেস্পেক্টর ? ৫০০৲ টাকা ঘুস্ নিয়েছেন, এই রকমেই পরিহাস করিতে হয়।"

হিরণ হাসিয়া বলিল "কেন, আর একবার সন্ন্যাসী হও।"

হিরণের সে অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করি নাই।

সকলে মিলিয়া সেই দিনেই মধুপুরে ফিরিলাম। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া পায়ের বেড়ী পায়ে পরিয়া বাটী ফিরিলাম। নরেশ আসিয়া আমাকে বলিল "দাদা একখানা *Registered cover* এ ৫০০৲ টাকা এসেছে সেটা কি করব ?"

আমি বলিলাম "ঐ টাকায় একখানি বই ছাপাতে হবে, সে বই খানার নাম হবে—"হারান হিরণ!" হিরণ বলিল—না ঠাকুরপো, বইখানার নাম হবে "গোবর গ ণ-এ একার্ শ।"

—০—

সম্পূর্ণ।